রাবণায়ন

কামাখ্যা ভট্টাচার্য্য

বেণু প্রকাশনী
৯ এ্যাণ্টনী বাগান লেন
কলিকাতা ৯

রাবণায়ন (Ravanayana mythological novel in Bengali based on the life of Ravana by Shri Kamakhya Bhattacharyya.)

প্রকাশক:
শ্রীকালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
বেণু প্রকাশনী
৯ এ্যাণ্টনি বাগান লেন

প্রকাশকাল:
অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

প্রচ্ছদ:
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

মুদ্রাকর:
শ্রীহরিপদ জানা
ষোড়শী প্রেস
৯ এ্যাণ্টনি বাগান লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

পিতামহ স্বর্গীয় আদিনাথ ভট্টাচার্য্যের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

প্রকাশকের নিবেদন

'রাবণায়ন' প্রকাশ করতে গিয়ে প্রথমে দ্বিধান্বিত ও সংশয়গ্রস্ত হয়েছিলাম। কারণ, অপ্রিয় হলে সত্য কথাও নাকি বলতে নেই— এই নীতি-বচন মনে জেগেছিল। রামায়ণ ও রামের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমাদের মনে সুদীর্ঘকাল ধরে যে সংস্কার সুপ্রোথিত হয়ে আছে তা যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে খণ্ডন করেছেন লেখক তাঁর এই গ্রন্থে। মোহান্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটা বলিষ্ঠ প্রতিবাদও বলা চলে। তাই, পাঠক কি দৃষ্টি দিয়ে এ পুস্তক গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে সংশয়ান্বিত হয়ে উঠছিলাম।

কিন্তু যখন দেখলাম শ্রদ্ধেয় নারায়ণ চৌধুরীর মত বলিষ্ঠ সাহিত্যিক এই পুস্তকের ভূমিকা লিখে দিতে সানন্দে সম্মতি দিলেন তখন আমার দ্বিধা ও সংশয় কেটে গেল। বিশেষ করে তাঁর ন্যায় নির্ভীক স্পষ্টবাদী সাহিত্যিক, তাঁর সাহিত্যকর্মের সসম্মান স্বীকৃতি হিসেবে যখন 'বিদ্যাসাগর পুরস্কারে' ভূষিত হলেন, তখন আরও উৎসাহিত হলাম।

সত্যিই তো, আমাদের অপ্রিয় সত্যকথা না বলার নীতি ব্যক্তির ভাল-মন্দের বিচারে খাটে কিন্তু যে মিথ্যা বা অসত্য বহুর ক্ষতির সহায়তা করে বা মানুষকে অন্ধসংস্কারে মোহগ্রস্ত রেখে প্রতারণার সুযোগ সৃষ্টি করে সমাজে বহুর অকল্যাণ আনে তার বিরুদ্ধে যত অপ্রিয়ই হোক সত্যকথাটা বলা উচিত। তাই আমি এই পুস্তক প্রকাশে অগ্রসর হলাম। নারায়ণ চৌধুরীর ন্যায় উদারপ্রাণ মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই।

অবশ্য, পুস্তক প্রকাশ করব, মনের এই সিদ্ধান্তটাই পুস্তক প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন। এই 'অনেক কিছু'র প্রয়োজনটা মিটিয়েছেন শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী, ডাঃ হিমাংশু রায়, এম, ডি ; উত্তর দমদম পৌরসভার কমিশনার শ্রীযোগেন সরকার। তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

বেণু প্রকাশনীর প্রকাশিত পুস্তকতালিকা

ঘৃতাচীর প্রেম—	কামাখ্যা ভট্টাচার্য্য
তুঙ্গভদ্রা—	ঐ
প্রবন্ধ সমগ্র—	ডাঃ কে. পি. ঘোষ
স্মরণীয় দিন—	কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও অন্যান্য—	নারায়ণ চৌধুরী (এ. মুখার্জি এণ্ড কোং)
সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে—	নারায়ণ চৌধুরী (ন্যাশনাল বুক এজেন্সী)

ভূমিকা

নারায়ণ চৌধুরী

'রাবণায়ন' লঙ্কাধিপতি রক্ষোরাজ রাবণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত একখানি অভিনব ধরনের উপন্যাস। এই উপন্যাসের মূল অবলম্বন রামায়ণের বিদিত আখ্যায়িকা। কিন্তু কাহিনীর বিন্যাসে রামায়ণেব আখ্যানভাগের কাঠামোটি ভিন্ন আর কিছু গ্রহণ করা হয়নি। রাবণ চরিত্রের উপস্থাপনায় ও মূল্যায়নে গ্রন্থকার সম্পূর্ণ স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়েছেন—এমন দৃষ্টিভঙ্গী যাকে নানা দিক দিয়েই মৌলিক বলা যেতে পারে।

লেখকের বিচারে রাবণ শুধ্ একজন শ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক বীর রাজাই নন, একই সঙ্গে তিনি গণতন্ত্রের আদর্শেরও একজন পরম উদ্‌গাতা, নিপীড়িত-শোষিত জনদের অকৃত্রিম বন্ধু, রাজ্যশাসন-ব্যবস্থায় উচ্চ নীচ ভেদ নির্বিশেষে সকল প্রজার প্রতি একই রূপ ন্যায়নিষ্ঠ ও সমদর্শী হওয়ার পক্ষপাতী। অর্থাৎ রাবণ, আধুনিক কালের পরিভাষায় আমরা যাকে সাম্যবাদ বলি, প্রাচীন কালের পটভূমিকায় সেই নীতি অনুসরণ করে পৃথিবীতে একটি নববিধান রচনায় ব্রতী ছিলেন। গ্রন্থকারের অনুভব, রাবণ রাজা ছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত রাজতন্ত্রে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র কিংবা যাজকতন্ত্রের আধিপত্যের কোন স্থান ছিল না। বরং আর্যকুলের পরিপোষিত আর্য-অনার্যের ভেদের ওপর গড়ে-ওঠা নিতান্ত অসম ও অন্যায় রাজতন্ত্রের তিনি ছিলেন এক প্রধান বৈরী। শুধু তাই নয়, এই শ্রেণীপক্ষপাতপূর্ণ অত্যাচার-অবিচারে ভরা শোষণভিত্তিক রাজতন্ত্রের ধ্বংস সাধনে তিনি সকল শক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

রামের প্রতি রাবণের বিমুখতা এ কারণে নয় যে, রাম তাঁর শত্রু-পক্ষাবলম্বী ছিলেন, মূলতঃ এ কারণে যে, রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের নামে আর্য জাতির সম্প্রসারণের অভিযানকে সুদূর দক্ষিণের লঙ্কাদ্বীপ পর্যন্ত

এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত এবং ওই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বর্ণ-শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার ওপর আধারিত, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অসাম্য ও বৈষম্য পূরিত ব্রাহ্মণ্যসেবিত রাজতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট। রাবণ ছিলেন এই অন্যায্য রাজতন্ত্রের প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক। তাই রাম-রাবণের যুদ্ধ, আর্য-অনার্যের সংগ্রাম, উত্তরাপথ-দক্ষিণাপথের মধ্যে প্রাণঘাতী সংঘর্ষ। এই যুদ্ধে রাম জয়ী হয়েছিলেন সন্দেহ নেই তবে সে জয় ন্যায়ের ওপর অন্যায়ের জয়, ধর্মের ওপরে অধর্মের জয়।

অতিশয় অ-গতানুগতিক বলিষ্ঠ মতবাদ নিঃসন্দেহে এবং গল্পাংশের বর্ণনায় এরূপ একটি অভিনব মতবাদের প্রচারে যে প্রভূত নির্ভীকতার প্রয়োজন তাকেও প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলা যায়। কিন্তু এই পুস্তকের রচয়িতা শ্রীযুক্ত কামাখ্যা ভট্টাচার্য বোধ হয় এবংবিধ বলিষ্ঠতা ও নির্ভীকতার চর্চায় একক ভূমিতে দাঁড়িয়ে নেই—এ ক্ষেত্রে তাঁর একজন মহান্ পূর্বসূরী রয়েছেন। তিনি সর্বজনমান্য কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনই বাংলা সাহিত্যে প্রথম, যিনি তাঁর মেঘনাদ বধ কাব্যে রামায়ণে বর্ণিত রাম-রাবণ কাহিনীর চিরাভ্যস্ত ছকটিকে আপন অন্তর-পোষিত ন্যায়-অন্যায়ের ধারণার মানদণ্ডে যাচাই করে একেবারে উল্টে দিয়েছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্য গ্রন্থটিতে রাম-রাবণের চিরপরিচিত ভূমিকার বদল হয়ে গেছে; রাম সেখানে পররাজ্য-আক্রমণকারী রূপে চিত্রিত এবং স্বকার্য সাধনে অন্যায় ও মিথ্যাচারের আশ্রয়ী হয়েও দৈব সহায়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল। অন্যপক্ষে রাবণ স্বদেশপ্রেমী স্বজনবৎসল বীরশ্রেষ্ঠ নৃপতি, এবং মাতৃ-ভূমি রক্ষায় সর্বস্বপণে কৃতসংকল্প। একদিকে দৈবী দল ও প্রচণ্ড সংখ্যাশক্তি অন্যদিকে নিছক আত্মনির্ভরতা ও সীমিত দ্বৈপায়ণ শক্তি—এই বি-ষম যুদ্ধের পরিণামে রাবণের সবংশে সুনিশ্চিত নিধন। মধুসূদন কাহিনীর যবনিকা এইখানেই টেনে দিয়েছেন এবং আপন প্রতিভাবলে এক অসামান্য কারুণ্যের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছেন গোটা কাব্যদেহটির ওপর।

কামাখ্যাবাবু মধুসূদন-অঙ্কিত রাবণ-চরিত্রের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যগুলি

পুরাপুরি বজায় রেখেছেন : রাবণের গভীর স্বদেশানুরাগ, স্বজনপ্রীতি, সন্তানবাৎসল্য, প্রজানুরক্তি, অতুলনীয় শৌর্যবীর্য—সবই তাঁর লেখায় উজ্জ্বল রেখায় ও রঙে প্রতিফলিত। কিন্তু সেখানেই তিনি থেমে থাকেননি, রাবণ-চরিত্রকে তিনি আরও অনেক দূর টেনে নিয়ে গেছেন। পূর্ববর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও আরও কতকগুলি নতুন সংযোজনার দ্বারা রাবণ-চরিত্রকে একাধিক আয়তনমণ্ডিত করে তুলেছেন। এই বহুরায়তনিক রাবণ-চরিত্রে পাই, গোড়াতেই যে কথার খানিকটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, অনাদৃত ও শোষিত শ্রেণীগুলির প্রতি নিবিড় দরদ, অন্যায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, সকলের জীবনে সমান সুখ এনে দিতে না পারলেও সকলের জীবনে সমান সুযোগ প্রসারিত করার নীতিতে অবিচল বিশ্বাসী, বর্ণশ্রেষ্ঠত্বাভিমানী শ্রেণী-গুলির অহংকৃত ও উদ্ধত মনোভাবের প্রবল প্রতিরোধী, সর্বোপরি ব্রাহ্মণ যাজককুলের পোষিত রাজতন্ত্রের আপসহীন অরি। লেখক মনে করেন রামচন্দ্রের মধ্যে যত না গুণ তার চেয়েও বেশী প্রকাশ পেয়েছে প্রজানুরঞ্জনের অছিলায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের শ্রেণীস্বার্থরক্ষার আকুলতা এবং দেবসহায়তাপুষ্ট আর্য রাজতন্ত্রকে আরও দৃঢ়মূল করবার ব্যগ্রতা। সীতা-উদ্ধার একটা আপাত-উদ্দেশ্য মাত্র, রামচন্দ্রের দাক্ষিণাত্য অভিযানের মূল উদ্দেশ্য নিহিত ছিল পূর্বোক্ত এই গূঢ় অভিপ্রায়ের ব্যঞ্জনার মধ্যে।

শ্রীযুত ভট্টাচার্য গল্পাংশের বিস্তৃতিতে রামায়ণের মূল ঘটনার ধারার ব্যত্যয় না ঘটিয়েও রাবণ-চরিত্রের বিকাশের ক্রমগুলিকে ধাপে ধাপে অনুসরণ করে দেখিয়েছেন কেমন করে রাবণ উত্তর-জীবনে যা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তা হয়েছিলেন। তাঁর গণতন্ত্রপ্রীতি, সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি অস্খলিত নিষ্ঠা, নির্যাতিত ও অবজ্ঞাত শ্রেণীগুলির প্রতি অপরিমাণ সহানুভূতি—এ সবের মূলে আছে তাঁর জন্মকালীন পরিবেশ, পিতৃভবনে বাল্য ও কৈশোরের তিক্ত অভিজ্ঞতা, মাতামহ ও মাতার লাঞ্ছনা, অন্যান্য আরও নানা ধরনের বিসদৃশ ঘটনার গ্লানিকর প্রভাব। লেখকের পরিবেশিত আখ্যায়িকার রূপরেখা অনুসরণ করে বলি,

রাবণের মাতামহ সুমালী দেবতাদের চক্রান্তে লঙ্কার রাজ্যচ্যুত হয়ে আত্মরক্ষার্থে পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং লঙ্কার সিংহাসন অন্যায় ভাবে বি-দৌহিত্র কুবের-কর্তৃক অধিকৃত হয়। সুমালীর কন্যা কেকশী সাময়িক বিভ্রম বশতঃ সপত্নী আছে জেনেও মুনি বিশ্রবাকে পতিত্বে বরণ করেন এবং অচিরেই তাঁর মোহভঙ্গ হয়, আর্যত্বের অহমিকায় গর্বিত মুনি বিশ্রবা, দানবনন্দিনী অপবাদে কেকশী ও তাঁর সন্তানদের (রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পণখা) অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখতে থাকেন ও তাঁদের নানাভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন—নিতান্ত অনাদরে ও অবহেলায় রাবণ ও তাঁর ভাইবোনের জীবন বেড়ে উঠতে থাকে, পিতার হস্তে মায়ের নিত্য লাঞ্ছনায় রাবণের সংবেদনশীল চিত্ত পিতার বিরুদ্ধে ক্ষোভে রোষে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ওই অন্যায়ের প্রতিবিধানে কঠিন সংকল্পবদ্ধ হয়, ক্ষোভ আরও বর্ধিত হয় পিতৃ-আশ্রমের পার্শ্ববর্তী নিষাদ-পল্লীর নিষাদদের উপর মুনিঋষিদের অনুষ্ঠিত অবর্ণনীয় অত্যাচারের দৃষ্টান্তে। রাবণ ভাইদের সহ আশ্রম ত্যাগ করে দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসে থেকে কঠোর তপস্যায় নিরত হন। তার পরের অধ্যায়েই দেখা যায় রাবণ বাহুবলে ভুবনবিজয়ী, দেববর্ণিনী পুত্র সৎ-ভ্রাতা কুবেরকে উৎখাত করে লঙ্কার সিংহাসনে সমাসীন, এমনকি দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর ভয়ে স্বর্গরাজ্য থেকে পলায়িত।

এর পরেই এসেছে রামায়ণের বহুল পঠিত কাহিনীর সংশ্লিষ্ট অংশের পুনর্কথন। সম্ভবতঃ বহুজ্ঞাত বলেই লেখক এই অংশগুলির বর্ণন খুব সংক্ষেপে সেরেছেন। সেই পঞ্চবটী বনে রামলক্ষ্মণের হস্তে জনস্থানের অধিনায়িকা রূপলাবণ্যময়ী কিন্তু বিধবা শূর্পণখার লাঞ্ছনা, ভগ্নীর অপমানে ক্রোধাবিষ্ট রাবণের উপর্যুপরি প্ররোচনার দ্বারা তাড়িত নিরুপায় মারীচের স্বর্ণমৃগরূপ ধারণ ও তদ্দ্বারা সীতাকে প্রতারিতকরণ, রাবণ-কর্তৃক সীতা হরণ, জটায়ু বধ, সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হওন ও অন্যায় যুদ্ধে বালি হনন, সুগ্রীব চমূ কপিসেনাদের সহায়তায় সমুদ্র বন্ধন পূর্বক লঙ্কা আক্রমণ ও একে একে

রাবণাত্মজদ্বয় রাবণানুজ ও স্বয়ং রাবণকে বধকরণ, লঙ্কাধ্বংস, সীতা উদ্ধার, ইত্যাদি।

এই পরিচিত ছকের পুনর্বর্ণনাংশের মধ্যে যেটা সবচেয়ে লক্ষণীয় তা হলো, রাবণ প্রতিহিংসার তাড়নায় কিছু অনুচিত মনোভাব ও অনৈতিক কাজের প্রশ্রয় দিলেও নীচতাকে কোথাও আস্কারা দেননি। তিনি নারীহরণের মত গর্হিত কাজ করেছেন ঠিক কথা, কিন্তু লাম্পট্যের অনুবর্তী হননি। রাবণের আত্ম-আরোপিত সংযম দেশী-বিদেশী নতুন-পুরাতন একাধিক বিদগ্ধ লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এই লেখকেরও করেছে। পৌরাণিক কালের পটভূমিকায় অপহৃতা নারীকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও তাকে অস্পৃষ্ট রাখার ঘটনা খুব বিরল। এই-খানেই রাবণ-চরিত্রের মহত্ত্ব ও অন্যান্যদের থেকে পার্থক্য। লেখক এই পার্থক্যটিকে বড় সুন্দররূপে পরিস্ফুট করে তুলেছেন।

লেখক সর্বত্র সমান ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছেন এমন মনে হয় না। রাবণের প্রতি সহানুভূতির আতিশয্যে তিনি রামচন্দ্রের প্রতি বেশ কিছুটা নিষ্করুণ হয়েছেন এরূপ ভাবা যেতে পারে। সীতাবিরহে আত্মহারা রামের পক্ষে ক্ষেত্রবিশেষে ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখা লুপ্ত যদি হয়েও গিয়ে থাকে তাতে প্রমাণ হয় না তাঁর অন্যান্য গুণাবলীর মাহাত্ম্যকীর্তন-যোগ্যতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মধুসূদন যেমন নিতান্ত অনুচিত ভাবে বলেছিলেন "I hate Rama and his rabble", এই গ্রন্থের লেখকও কতকটা সেই ভাবে ভাবিত হয়ে একদেশদর্শিতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাম-চরিত্রের বিচারে অগ্রসর হয়েছেন। রামের মহত্ত্ব যদি স্বতঃসিদ্ধ না-ই হবে তবে গোটা উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের জনগণের চিত্তে তাঁর আসন এমন স্থায়ী ও অবিসংবাদিত হতে পারতো না। একটা জাতির বহুব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তির অভিব্যক্তিকে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বাস্তব সত্যকে অলীক জ্ঞান করবার যো নেই।

যাই হোক, এটা হলো দেখার ভঙ্গীর রকমফেরের প্রশ্ন, ঝোঁকের তারতম্যের কথা। তার দ্বারা লেখকের রাবণ-সম্পর্কিত মৌলিক

প্রতিবাদ্যের সারবত্তার হানি হয় না। রাবণকে তিনি একজন ন্যায়-নিষ্ঠ সমজ্ঞানী গণতন্ত্রপ্রেমী স্বদেশবৎসল বীরাগ্রগণ্য নরপতিরূপে অঙ্কিত করেছেন—তাঁর এই মূল্যায়ন যথেষ্ট মূল্যবান। এই মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে লেখকের যে মনের পরিচয় পাওয়া যায় তা একটি উৎ-পীড়িতের দুঃখকাতর গণদরদী মন। এই মনটিকে সর্বৈব উৎসাহিত করবার প্রয়োজন আছে। ইতঃপূর্বে কামাখ্যাবাবুর আরও যে দু-একটি পুরাণভিত্তিক উপন্যাস পড়েছি—'তুঙ্গভদ্রা' ও 'ঘৃতাচীর প্রেম'—তার মধ্যেও সাম্যাদর্শে নিবেদিতচিত্ত একইরূপ মনন ও কল্পনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বইটিতে সেই প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য যেন আরও বেশী পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

লেখকের ভাষা রীতিমত ধ্বনিসমৃদ্ধ। সংস্কৃত শব্দ সংস্কার বাগ্-বিন্যাসের পাকে পাকে জড়িয়ে থেকে তাকে শুধু ঐশ্বর্যশালীই করেনি, গাম্ভীর্যও দিয়েছে। আজকের শিথিল-তরল এলানো গদ্যের যুগে এই সুগঠিত শব্দজাল সমচ্ছিন্ন দৃঢ়পিনদ্ধ বাগ্‌বন্ধ ভাষাশিল্পীদের কাছে একটা অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত রূপে গণনীয় হওয়ার অপেক্ষা রাখে। তবে এ ভাষার সীমাবদ্ধতাও আছে। পৌরাণিক চালের কাহিনী বয়নের বেলায় এ বাক্‌রীতি যত খোলে আধুনিক বিষয়বস্তু সমন্বিত কথাসাহিত্যে ততটা নয়। এই সীমাবদ্ধতা মনে রেখে উপযুক্ত ক্ষেত্রে যদি এই ভাষাভঙ্গীর প্রয়োগ হয় তবে আর তার মার নেই।

রাবণায়ণ

॥ ১ ॥

নৃপতি সুমালী। লঙ্কার সেই পুষ্পকানন-শোভিত শ্বেতশিলাময় প্রাসাদের অভ্যন্তরে নীল-লোহিত মণিরত্ন-খচিত সিংহাসনে নয়, বসে আছেন রসাতলে, নিভৃতে এক শিলাখণ্ডের উপরে। রসাতলে আত্মগোপন করে আছেন তিনি। দেবতাদের আক্রমণে পর্যুদস্ত, সিংহাসনচ্যুত, রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে এক চরম দুঃখের সাগরে ভাসছেন তিনি। তাঁর ক্ষুব্ধ হৃদয় মনে করে,—নব অস্ত্রবলে বলীয়ান আর্য দেবতাগণ দস্যু-তস্করের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা পরস্বাপহারী, পররাজ্যলোভী, লুণ্ঠক। তারা বর্ণদম্ভে আত্মম্ভরী, সংস্কৃতিহীন একটা দুর্ধর্ষ যাযাবরগোষ্ঠি মাত্র। ভিন্নবর্ণের সভ্যতা আর সংস্কৃতির ধ্বংসস্তূপের উপর নিজেদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। তা না হলে, লঙ্কার ঐ প্রকৃতির শোভা, সংস্কৃতির সৌধ, তাদের হৃদয়কে কি এতটুকুও স্পর্শ করত না? বিনা প্ররোচনায় লঙ্কাকে তারা কি ঐ ভাবে ধ্বংস করতে পারত? অথবা, আমাকে সিংহাসনচ্যুত, বিতাড়িত করে লঙ্কার সিংহাসন কি শূন্য রাখতে পারত?

শিলাপ্রাচীর নয়, কি একটা কঠিন প্রাচীর দিয়ে যেন তাঁর সমস্ত স্বাধীন সত্তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, বুঝতে পারলেও প্রতিকার করতে তিনি অক্ষম। এ দুর্লঙ্ঘ্য কঠিন প্রাচীর তাঁর নিজেরই রচনা। চরাচরব্যাপ্ত ঐ স্তব্ধ নিথর অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবেন, নিজের মনের পথহীন অন্ধকারের মতই দুর্ভেদ্য ঐ অন্ধকার। তাঁর জীবনের সমস্ত তেজ, সমস্ত স্নিগ্ধ জ্যোতি যেন ঐ বিরাট দুর্ভেদ্য অন্ধকারের করাল নিঃশ্বাসের আঘাতে চিরকালের মত নিভে যেতে চলেছে। অন্তরগভীরের জ্বালা-বেদনা-ব্যর্থতা যেন পাবকশিখার মত মনের অন্ধকারে পথের সন্ধান করে ফিরছে। কখনও বিষণ্ণ চিন্তায় উন্মনা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন অস্ত রবির গৈরিক রাগরঞ্জিত দিগ্‌বলয়ের দিকে আর হতাশ-ভরা দীর্ঘশ্বাস মিলিয়ে দেন রসাতলের বিষণ্ণ সমীরে।

কখনও-বা নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকেন ঐ দূর বিস্তারিত সীমাহীন নীলাম্বুরাশির দিকে। নিরীক্ষণ করে দেখতে চেষ্টা করেন, ঐ সবুজ সুন্দর ভূখণ্ড দেখতে পাওয়া যায় কি না। যে সাগর-দুহিতা একদিন তাঁর কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছিল রাজমাল্য, যে সাগর-দুহিতা আর্য দেবতাদের অশুচি স্পর্শে কলুষিত হয়ে বন্দিনী হয়ে কাঁদছে। যার উদ্ধারের সমস্ত পথে জমে আছে ঘোর অন্ধকার। বন্দিনীর কোমল হৃদয় হতে এখনও বুঝি অদৃশ্য হয়ে যায় নি অগ্নিজ্বালার সেই বিভীষিকা।

কিন্তু, সঙ্কল্পে অটল হলেও মনের কাছে কোন উপায় খুঁজে পান না নৃপতি সুমালী।

স্বামীর জীবনের আনন্দকে সমস্ত অভিশাপের আঘাত থেকে রক্ষা করতে উপবনস্থলীর নিভৃত আসনে পতির পাশে এসে দাঁড়ান স্বামীর সমদুঃখ-সুখভাগিনী কেতুমতী। পতি-প্রেমিকা কেতুমতী সহজীবনপ্রার্থিনী ভার্যার সেবাকুল দৃষ্টি নিয়ে তাকান। কিন্তু দেখে চমকে ওঠেন। বনগিরির দাবানলের জ্বালাময়ী লীলা যেন জেগে উঠেছে নৃপতি সুমালীর নয়নে। বুঝতে পারেন কেতুমতী এ অনলজ্বালা নারীপ্রেম-কামনার অনল নয়। এ পৌরুষপ্রধান পুরুষের রাজ-ধর্মের অনল। তথাপি এগিয়ে যান কেতুমতী। বিশ্বাস করেন পুরুষের সর্বধর্মের শান্তিবারি নারী। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর সমস্ত ভুল ভেঙ্গে যায়। তাঁর সমস্ত বিশ্বাস বৈশাখী ঝঞ্ঝার আঘাতে বল্মীকস্তূপের মত তছনছ হয়ে যায়।

কেতুমতীর আগমনে বায়ুস্পর্শে অনলের মতই আরও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে নৃপতি সুমালীর অন্তরের জ্বালা। কেতুমতী কি নিবেদন করতে এসেছেন তা যেন তিনি অনুমানেই বুঝে নিয়ে বিস্ফোরিত হলেন, আর সেই জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল তপ্ত শিলার মত কতগুলি রূঢ় কথা।—আমি পীড়িত হই জেনেও তুমি অদ্ভুত এক মিথ্যা কল্পনাকে অন্তরে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছ কেতুমতী, যা শুধু মিথ্যাই নয় গুরুতর অন্যায়ও বটে। আশ্চর্য এই নারীজাতি। এত নিগ্রহেও

তোমার সম্বিত জাগল না। তোমরা সম্পদের দাসী, ভোগ-সর্বস্ব। যতক্ষণ পুরুষ সম্পন্ন থাকে ততক্ষণই তারা তোমাদের প্রিয়। বিপন্ন হলে অবলীলায় তাদের ত্যাগ করে চলে যেতে পার। রসাতলে আমার এই দুঃখ-কষ্ট যদি সহ্য করা তোমার পক্ষে অসম্ভব হয় তবে তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যেতে পার। গন্ধর্বরাজ বহু গ্লানিকর লাঞ্ছনা সহ্য করেও আর্যদের প্রীতিভাজন হতে সক্ষম হয়েছেন। অথবা তোমার রুচিকর যে-কোন স্থানে তুমি চলে যেতে পার। কিন্তু তুমি গন্ধর্বরাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে আমাকে প্ররোচিত করবে না।—না, না, অসম্ভব। আর্যদেবতাদের ঈর্ষাপরায়ণ অন্যায় প্রভুত্বের কাছে আমি কোনক্রমেই শির নত করব না। মনুষ্যত্বের মানদণ্ড—সম্পদ নয়, সুখ নয়, ক্ষমতা নয়—স্বাধীন মর্যাদাবোধই মনুষ্যত্বের মানদণ্ড।

রবরোষিত কেশরীর মত স্বামীর রোষকম্পিত তপ্তভাষণ শুনে লজ্জায় ঘৃণায় কাঁপতে থাকেন কেতুমতী। ক্রন্দনের রোল ওঠে তাঁর অন্তরে। নৃপতি সুমালীর এই রূঢ় ভাষণের সাথে তিনি কোনদিনই অভ্যস্ত নন, পরিচিত নন। ক্ষণমধ্যেই স্নিগ্ধদর্শন সেই নারীর সারা দেহমন যেন একটা দারুণ ম্লানিমায় কলঙ্কিত হয়ে উঠল। অপমান আর লজ্জায় সারা দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠল। নীরবে অশ্রুপাত করতে থাকেন তিনি। অকালে বারিস্পর্শে বিস্ময়ে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে তাকায় পদতলের দূর্বাদল। নারীত্বের অপমান নীরবে আর্তনাদ করে ওঠে কেতুমতীর বক্ষের গভীরে। অশ্রুভরা সজল নয়নে লাঞ্ছিতার দৃষ্টিতে তাকান স্বামীর দিকে। অন্তরের ক্রন্দন-ধ্বনি-লাঞ্ছিত সেই দৃষ্টি।

হঠাৎ কেতুমতীর দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠেন নৃপতি সুমালী। স্নিগ্ধরূপা কেতুমতী যেন আতপতাপদগ্ধ কৌমুদীর মত ম্লান হয়ে গেছেন। তাঁর নীলনয়নে অশ্রু যেন অগ্নিজ্বালা বিভীষিকা বলে মনে হচ্ছে। তাঁর নীরব এক একটি অশ্রুবিন্দু যেন নৃপতি সুমালীর তপ্ত ভাষণের এক একটি শব্দ হয়ে তাকেই প্রত্যাঘাত করছে। আত্মঘাতের এক দারুণ অস্থিরতা বোধ করেন সুমালী। তাঁর হৃৎপিণ্ড

আত্মধিক্কারে কলুষিত হয়ে ওঠে। অপরাধীর মত বিনয় বচনে ডাকেন—কেতুমতী।

বলুন, নৃপতি সুমালী,—আপনার ক্ষত হৃদয়ের বেদনা উপশম করতে আরও বলে যান স্বামী—'নারী সম্পন্নের দাসী,' 'পতি হলেও বিপন্ন হলে তাঁকে অবলীলায় ত্যাগ করে যেতে পারে,'·····আরও, আরও, যা আপনার অভিরুচি, তথাপি আমি স্বামী ত্যাগ করে সতী নারীর পথচ্যুত হব না। পতি ত্যাগ করে শত সুখ-স্বর্গের লালসায়ও ধাবিত হব না। পিতা গন্ধর্বরাজ পথচ্যুত হলেও আমি আমার পৌরুষময় স্বামীকে পথচ্যুত হতে বলব না, শত দুঃখেও আমি আমার পৌরুষপ্রধান স্বাধীনতাপ্রিয় পতিগর্বে গর্বিতা।

কেতুমতীর শান্ত-শুদ্ধ, শুচি-নির্মল কথাগুলি যেন এক উদার আকাশ-বক্ষের ভাষা, অভিমান-ভরা জলদ-সরসা অথচ তাতে বজ্র আছে। অদ্ভুত এক বিস্ময়াপন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সুমালী। বুঝতে পেরেছেন, এক সাধ্বী পত্নীর বক্ষের গৌরবকে আহত করেছেন তিনি।

—কেতুমতী!

—বলুন প্রভু। আরও কি আছে বলুন।

—আমি তোমাকে না বুঝে আঘাত করেছি।

—আরও আঘাত করুন প্রভু। এমন আঘাত করুন যাতে কেতুমতী নিঃশেষ হয়ে যায়, চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যায়। পতিপ্রাণা নারীর, পতির অবিশ্বসভাজন হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যুই কাম্য। আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল, এতকাল আমি যেন মিথ্যা এক দুঃস্বপ্নের রাজ্যে বাস করছিলাম।

সস্নেহে পত্নীকে বক্ষে টেনে নেন সুমালী। স্নিগ্ধ স্বরে বলেন,—শান্ত হও সুচারুদর্শিনী, মিথ্যা অভিমান করো না। বুঝতে চেষ্টা কর আমার অন্তরের কথা। দুরদৃষ্টের নিদাঘ তাপে আমি যে শুকিয়ে গেছি কেতুমতী। আমি যে দিবস-রজনী সকল কালপুরুষের কাছে প্রার্থনা করছি,—হে অদৃষ্টের দেবতা, আমাকে শক্তি দাও। এই

রসাতল-কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত দুঃখের প্রাচীর যেন চূর্ণ করতে পারি সেই মন্ত্রটুকু শিখিয়ে দাও। সব ক্ষতি, সব অপমানের অভিশাপ থেকে মুক্তির মন্ত্র আমাকে বলে দাও। কিন্তু কৈ, সব তো নীরব। সমস্ত বিশ্ব যেন ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেছে, কোন পথ নেই, কোন পথ নেই। এক এক সময় মনে হয় কি জান কেতুমতী, তোমাদের সমস্ত দুঃখের কারণ তো আমি, আমার স্বাধীনতার স্পৃহা। আমি যদি আমার উচ্চশির দেবতাদের পদতলে নত করতাম তবে আমাকে লঙ্কার সিংহাসন হারাতে হত না, তোমরাও স্বর্গসুখে থাকতে পারতে।—ব্যথিত হয় কেতুমতী, আহত অন্তরে সে বুঝতে পারে সুমালীর কথাগুলি যেন ভেসে আসছে কোন এক অভিমানের অন্ধকূপ থেকে বেদনার বায়ুভরে।

—প্রভু।—শান্তস্বরে কেতুমতী ডাকেন।

বিষণ্ণ প্রভাত যেমন মেঘের ছায়াস্পর্শে আরও ম্লান হয়ে যায়, তেমনি নীরব সুমালী সত্যই তাঁর হৃৎপিণ্ডের গোপন কক্ষে ধ্বনিত অদ্ভুত এক বেদনার বাণীর ছায়াপাতে আরও বিষণ্ণ আরও ম্লান হয়ে যান।

প্রভু! – ডাকেন কেতুমতী।

তথাপি নিরুত্তর। বিষাদ নীরবতায় শূন্যাকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন সুমালী।

কি এক অজ্ঞাত শঙ্কায় চম্‌কে ওঠে কেতুমতীর অন্তর। শরৎ শিশিরের স্নিগ্ধ স্পর্শের মতই ভেঙ্গে যায় প্রিয়ভাষিণী কেতুমতীর অভিমানের বল্মীকস্তূপ। ব্যগ্রকণ্ঠে বলেন,—প্রভু, আপনি অভিমান ত্যাগ করুন। স্বাভাবিক কথা বলুন।

কেতুমতীর আর্তনাদ শুনে তাকান সুমালী।

চন্দ্রকরস্পর্শে বিকশিত কৌমুদীর মত আয়তনয়না কেতুমতী, ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাস্য বিকশিত করে তাকান স্বামীর দিকে। বিনম্র কাতর কণ্ঠে বলেন,—আমাকে মার্জনা করুন, প্রভু।

—প্রিয়ে, রাজধর্ম প্রেম বোঝে না, ভালবাসা বোঝে না, স্নেহ

মায়া-মমতা তাদের কাছে অপরিচিত। এ হেন এক নিষ্ঠুর ধর্মের প্রতিভূ আমি, যে ধর্ম শুধু বোঝে, ক্ষমতা আর অপহরণ। এ হেন এক অপধর্মের নায়ক হবার জন্য আমি কাতর। কি বিচিত্র এই মনুষ্য চরিত্র। মানব ধর্ম খর্ব করবার জন্য যে ধর্ম সদাই উদ্যত অস্ত্র, আমি তারই অর্চনা করতে অহর্নিশ অর্ঘ্য রচনা করছি।

—প্রভু, আমি সামান্য নারী। গূঢ় তত্ত্বকথা আমি বুঝতে অক্ষম। আমি নারীধর্ম বুঝি।

—কি তোমাদের সেই নারীধর্ম ?

—বাল্যে ও কৈশোরে পিতামাতাকে আনন্দদান, যৌবনে স্বামীর সহধর্মিনী হয়ে সুখভোগ, বার্ধক্যে অপত্যবান্ধবী হওয়া।

ওষ্ঠসন্ধিতে ঈষৎ কৌতুক হাস্য সঞ্চার করে সুমালী বলেন,—গন্ধর্ব-নন্দিনী, আমি জানি তুমি বিদূষীনী, আমি জানি নারীধর্মের এই সহজ সরল গণ্ডীসীমা তুমি বিশ্বাস কর না, আজ নারীধর্মের এই সহজ সরল ব্যাখ্যায় নিশ্চয়ই তোমার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সত্য বল।

—সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি সব কিছুর ঊর্ধ্বে নারীর একমাত্র কাম্য হল প্রেমিকের প্রিয়া হওয়া, বধূ হওয়া, গৃহিণী হওয়া, সন্তানলাভে সার্থক হওয়া, কর্তব্যপরায়ণা হওয়া।

—তবে তুমি পূর্ণ হয়েছ, তোমার জীবন সার্থক হয়েছে।

—না।

—তবে ?

—পুত্রকন্যার জীবন সার্থক করার মধ্যেই আছে নিজের সার্থকতা। কর্তব্য এখনও অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

—কি সেই কর্তব্য ?

—কৈকশী যৌবনপ্রাপ্তা হয়েছে। এখনও অনূঢ়া রয়েছে। সে কথাই বলতে এসেছিলাম প্রভু, কিন্তু সবই ভেঙ্গে দিলেন আপনি।

—না, কিছুই ভাঙ্গি নি।—নতুন এক দুশ্চিন্তাভরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন রাজা। পার্থিব জগতে সকল সমস্যার চাইতেও এ সমস্যা যেন গুরুতর। তারপর অসহায়ের মত বলেন,—

কিন্তু, আমি কি করতে পারি, প্রিয়ে। আমি যে অসহায়। রাজ্যভ্রষ্ট আত্মগোপনকারী এক নৃপতি। এমন কি, আর কোনদিন সেই হৃতরাজ্য, হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারব কিনা জানি না। লক্ষণও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমার আত্মপ্রকাশে বহু অনর্থ ঘটতে পারে, এমন কি, আমার নিধন পর্যন্ত।

বিচলিত ত্রাসে কেতুমতী বলে ওঠেন,—না না, সে অসম্ভব। আপনি কখনও আত্মপ্রকাশ করতে পারেন না।

—তবে ?—বলে বিষাদ-অলস দৃষ্টিতে তাকান দিগ্‌বলয়ের দিকে।

কেতুমতী তাঁর স্নিগ্ধ সুন্দর অধরে স্নিগ্ধ এক সান্ত্বনা সুস্মিত করে দ্বিধাসঙ্কোচসিক্ত কণ্ঠে বলেন,—কৈকশী যদি স্বেচ্ছায় কাউকে দয়িত নির্বাচন করে।

—কিন্তু নৃপতি সুমালীর কন্যা স্বয়ম্বরা হবে অনাড়ম্বরে, নীরবে অতি সঙ্গোপনে আর তা নৃপতি সুমালীকে দেখতে হবে নীরবে! এ যেন এক শাস্তির যন্ত্রণা! এ যেন এক শক্তিমানের অনিচ্ছাকৃত গরল সেবন।

—বিচলিত হবেন না প্রভু, আমরা অবস্থার দাস। আমরা নিরুপায়। তাই বলে যৌবন অপেক্ষা করবে না। নারীর যৌবন একস্রোতা।

কিংকর্তব্য বুঝে উঠতে পারেন না সুমালী। নারীর যৌবন-সমস্যা বুঝাও তাঁর পক্ষে দুরূহ। কোনদিন তা নিয়ে ভাবেনও নি. ভাবার অবকাশও ছিল না। অনভিজ্ঞের মত পথের সন্ধান খুঁজতে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কেতুমতীর দিকে। এই অবোধ পুরুষের প্রতি মায়া হয় কেতুমতীর।

—কৈকশীর পতি-নির্বাচন কি তুমি করেছ কেতুমতী? অথবা কৈকশীর নির্বাচনে তোমার সম্মতি আছে?

—এ স্বয়ংবর সভায় পতি-নির্বাচন নয় প্রভু। আমার মনোনীত জনে কন্যার আত্মনিবেদন।

—কে, সেই ব্যক্তি!

সঙ্কোচ বিহ্বলে নীরব হন কেতুমতী। ভাবেন, এ প্রস্তাব সুমালীর বিশ্বাসের সৌধে আর্তনাদ হয়ে না ওঠে। নিরুপায়ের মত ভীরু দৃষ্টিতে তাকান স্বামীর দিকে।

—সঙ্কোচ কেন প্রিয়ে। অকপটে মনের কথা প্রকাশ কর।

কেটে যায় কেতুমতীর সঙ্কোচ বিহ্বলতা। শঙ্কার তুষার ভেঙ্গে বেড়িয়ে আসে একটা নাম,—ঋষি বিশ্রবা।

যেন চম্‌কে আর্তনাদ করে ওঠেন নৃপতি সুমালী। বিস্ময় বিলম্বিত সুরে যেন প্রতিধ্বনি করতে থাকেন,—ঋ-ষি-বি-শ্র-বা! অতি-বিস্ময়ের চাঞ্চল্য যেন দ্রুত আলোড়িত হতে থাকে তাঁর হৃৎপিণ্ডে।—তথাপি এক আর্য-ঋষি তোমার চিন্তাজগতে স্থান করে নিল! দৈত্য-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষ কেউ নয়, এক আর্য-ঋষি! কেতুমতী, শেষ পর্যন্ত তোমার কন্যার হৃদয়ের পতি-কক্ষে স্থান করে দিতে চাও একজন আর্য-ঋষিকে?

আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়েছে কিনা কেতুমতী বুঝতে পারছেন না। অথবা প্রদোষের অন্ধকার অসময়ে তাঁর চক্ষুর সম্মুখে নেমে এল কিনা বুঝতে পারছেন না। শুধু বুঝতে পারছেন তাঁর দৃষ্টিপথ যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে একটা অপরিচিত অন্ধকারে। শিলামূর্তির মত স্তব্ধ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। নৃপতি সুমালী ওষ্ঠ যুগলে এক ব্যঙ্গ-বক্র হাস্যের সঞ্চার করে বলেন,—তোমার কন্যার জীবন সার্থক করতে এক অতি উত্তম পাত্রের সন্ধান করেছ গন্ধর্ব-নন্দিনী। এ কি কুটনৈতিক প্রতিশোধ?

লজ্জায় সঙ্কোচে লজ্জাবতী লতিকার মত আপনি আপনার মধ্যে যেন মিশে যাচ্ছেন কেতুমতী। নিজের মনের এই দুঃসাহসকে নিজেই ভ্রুকুটি হেনে স্তব্ধ করে দিলে বুঝি বা ভাল হত। দুঃসহ এই যন্ত্রণাক্ত অবস্থায় অসহায়ের অবলম্বনের মত বলেন তিনি,—শুনেছি, ঋষি বিশ্রবা উদারপ্রাণ, সুশ্রী ও সম্পন্ন।

ক্ষণেকের জন্য বিষণ্ণ এক তন্দ্রার ঘোরে যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন সুমালী। তারপর পরাজিতের মত মৃদুহাস্যে বলেন—তাঁরা

উদার নিজ বর্ণে। তুমি কি জান কেতুমতী,—ঋষি বিশ্রবার প্রথম ভার্যা দেববর্ণিনী ঋষি ভরদ্বাজ-দুহিতা ?

—শুনেছি।

—তোমার কন্যা রাক্ষস-নন্দিনী কৈকশী হবে দ্বিতীয়া।

—স্বাভাবিক।

—সমভাবে আদৃতা হবে বলে বিশ্বাস কর কি ?

—বিশ্বাস করি। মনে করি, পুরুষকে জয় করার দায়িত্ব নারীর। নারীর কাছে পুরুষের চাওয়া সামান্য। সামান্যেই পুরুষ তুষ্ট। পুরুষের কাছে নারীর চাওয়া অনেক। অনেক পেতে হলে সামান্য দিতে হয়।

—তুমি কি বিশ্বাস কর কেতুমতী, কোন আর্য তাঁর বর্ণসঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে সর্বজনে সমদর্শী হতে পারে ?

—প্রভু, আলো-আঁধার যেমন এই বিশ্বপ্রকৃতির যমজ সন্তান, তেমনই ভাল-মন্দ মনুষ্য সমাজের যমজ সৃষ্টি।

—উত্তম, প্রিয়ে। তুমি তোমার পথে অগ্রসর হতে পার !—মনে মনে বিষাদ-বিদ্রূপের হাসি হাসলেন সুমালী—যাও নারী, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর। তবে এই অভিজ্ঞতা কঠিন স্নেহবস্তুর বিনিময়ে। আমি বিশ্বাস করি না, সংস্কৃতিহীন যাযাবর একটা জাতি যারা অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে শুধু যুদ্ধজয় আর অপরের সংস্কৃতিকে নির্মমের মত ধ্বংস করতেই জানে তারা উদারপ্রাণ, সর্ববর্ণে সমদর্শী হতে পারে। যাও নারী, প্রতারিত হওয়াই তোমাদের ভাগ্যলিপি। যাও, প্রতারিত হও, আর ক্রন্দন কর। এতেই তোমাদের সুখ।

॥ ২ ॥

কালচক্রের আবর্তনে নিত্য নিয়মিত দিবাকর আর নিশানাথ আসেন যান। কিন্তু নগদন্তে উচ্চশির মেরু পর্বতের সর্বাঙ্গ আলো করে তুলতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। ফিরে যান শুধু একটি নারী হৃদয়ের গোপন বিলাপ ক্রন্দনের সাক্ষী হয়ে। তাঁরা শুধু দেখেন, প্রতি প্রদোষে সেই নারী আশ্রম উপান্তের তরাগ সলিলে অবগাহন শান্তি নিয়ে ফিরে যান আশ্রমে। সলিল শুধু পারে দেহের শান্তি দিতে, মনের শান্তি দিতে পারে না। প্রতি প্রভাতে ভাস্করের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সে নারী বলে,—প্রভু, আমাকে মুক্তি দাও। মেঘাবৃত অন্ধকার দিনের মতই মিথ্যা আমার এ জীবন। কি মূল্য আছে নারীত্বের মর্যাদাক্ষুণ্ণ আমার এই ব্যর্থ জীবনের। যে নারী কোনদিন পতির কাছে পত্নীর মর্যাদা পেল না, শুধু শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার আহ্বান ভিন্ন পতির কাছ থেকে সহব্রতের আহ্বান পেল না, আশ্রম-দাসীর মত যে শুধু নিরস কর্তব্যচারিণী, নিজের ইচ্ছায় আহূত শোভাহীন ভাগ্যকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার অধিকার যার নেই, যে শুধু উত্তাপহীন তৃষ্ণা, আগ্রহহীন লালসা আর আকুলতাহীন সম্ভোগের সামগ্রীমাত্র, কি মূল্য আছে তবে সেই নারী-জীবনের। প্রভু আদিত্য, আমাকে মুক্তি দাও। এই মরুজ্বালাময় পতিগৃহ থেকে আমাকে মুক্তি দাও। এ তো স্নেহনীড় নয়, অবজ্ঞা আর অবহেলার উত্তাপে শুকিয়ে যাওয়া ক্ষুদ্র এক মরুখণ্ড মাত্র। এই মরু-জ্বালায় আমার সন্তানদের শত কামনার পুষ্পদল শুকিয়ে পুড়ে ভস্ম হতে চলেছে। আমার সন্তানদের জন্য বিন্দু পরিমাণ সমবেদনাও নেই এই মরু-হৃদয় ঋষির হৃদয়ে।

চাঁদ দেখেন নিশান্তে লতাগৃহের দীপ নিভিয়ে দিয়ে চুপ করে একান্তে বসে থাকে সেই নারী। যেন অবহেলার ধূলিময় মালিন্য হতে মুক্তির প্রতীক্ষায় জীবনের সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিসর্জন দিয়ে বসে থাকে।

দিন যায়, মাস অতীত হয়, বর্ষের পর বর্ষ অতিক্রান্ত হয়, কানন-ভূমির নিভৃতে কত বসন্ত পার হয়, কিন্তু তার জীবন যেন চিরনিদাঘ তাপিত জীবন। আশ্রম কুটিরের নিভৃতে বসে দিন কাটায়। তার জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য যেন অপহরণ করে নিয়েছে তার বর্ণাভিমানী মরুহৃদয় স্বামী। দুর্বিষহ মনে হয় তার এই নিষ্ঠুর বন্ধন।

ভর্তা ঋষি বিশ্রবাকে কোনদিনই ভালবাসতে পারে নি কৈকশী। কেমন করে যে তা সম্ভব হতে পারে তাও বুঝে উঠতে পারে না সে। তার পত্নীত্বের মর্যাদা লাভের করুণ আকুতি বর্ণদম্ভী ঋষির কাছে বার-বার লাঞ্ছিত হয়েছে, সঙ্কুচিত হয়েছে সপত্নীর ভ্রূকুটিতে, বিড়ম্বিত হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে। পতিগৃহ একটা সুখ-শান্তির নীড় এ কথা ভাবতেও তার মন অবিশ্বাসের কুণ্ঠায় ভরে যায়।

কেনই বা ভালবাসতে পারবে। বর্ণাভিমানী যে ঋষির কাছে ক্রীতদাসীর চাইতে অধিক সম্মান যে নারী পেল না তার পক্ষে পতিগৃহ সুখ-শান্তির নীড় ভাবা কল্পনায়ও সম্ভব নয়। যে বর্ণদম্ভী পুরুষ অবিমিশ্র আর্যশোণিতের মর্যাদা দিতে ব্যাকুল, যে শুধু মনে করে পরবর্ণের নারী শুধু ভোগের বস্তু, ভার্যা বলে স্বীকার করার অর্থ দীনতা স্বীকার করা, কৈকশীর হৃদয় তাকে কখনও বরণ করতে পারে নি। কোন নারীর পক্ষে পারা সম্ভবও নয়। যে পিতৃহৃদয়ের তপ্ত বিতৃষ্ণায় শুকিয়ে যায় সন্তানের হৃদয়, কোন গর্ভধারিণী মাতা সে পতিকে হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিতে পারে না।

ঋষির এ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না কৈকশী। তার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করতে চায়। আর্য-চক্ষুর কঠোর শাসনে তার নিগৃহীতা নারীত্ব সকল অধিকার প্রতিহিংসার জ্বালায় ভস্মসাৎ করে দিতে চায়। কিন্তু তার সমস্ত দুঃখ, বেদনা, ক্ষোভ কঠিন এক আত্মধিক্কারের সুকঠিন প্রাচীরে যেন বন্দী হয়ে পড়ে। ভাবে,—এ ভগবানের রোষ নয়, কোন অদৃশ্যশক্তির অভিশম্পাৎও নয়, এ আমারই যৌবনের অভি-শাপ। যৌবনের মিথ্যা স্বপ্নমায়ায় আমি প্রতারিত হয়েছি। সেদিন বুঝতে পারি নি সুখকল্পনার যে উজ্জ্বল আলোক নিয়ে যাত্রা

করেছিলাম সুরু, আজ তা ধীরে ধীরে বেদনার কুজ্ঝটিকায় বিলীন হয়ে যাবে। আজ আমার চারদিকে শুধু দুঃখের অন্ধকার। শুধু অনূঢ়া জীবনের সুখস্মৃতিটুকু ক্ষীণ আলোকবর্তিকার মত বয়ে নিয়ে চলেছি মাত্র। চলেছি আর চলেছি, পথভ্রান্ত কোন বিমূঢ় পথিকের মত অরণ্যের পর অরণ্য অতিক্রম করে চলেছি সুখ-মন্দিরের আশায়। জানি না, এ দুঃখের জীবন আর কতকাল বহন করে চলতে হবে। অতিক্রম করতে হবে এ দুঃসহ জীবনের আর কত দীর্ঘপথ।

মনে পড়ে সেই প্রথম দিনে প্রথম সাক্ষাতের কথা। আমার যৌবনান্বিত দেহকে আতৃপ্তি উপভোগ করে ঋষি বলেছিলেন,—'প্রদোষকালে উপভোগ করলাম। তোমার সন্তান হবে দুরন্ত রাক্ষস'। হে ঈশ্বর, ঋষি বিশ্রবার সেদিনের সেই অভিশম্পাৎ যেন সত্য হয়, সার্থক হয়।—নিদ্রিত রাবণের ওষ্ঠ চুম্বন করে কৈকশী। তার আয়ত আঁখিযুগল সিক্ত হয়ে ওঠে। স্বগত বলতে থাকে,—বৎস, তুমি দুরন্ত হয়েছ, আরও দুরন্ত হও। তুমি জান না, তোমার মায়ের অন্তরে লুকিয়ে আছে কত ব্যথা। তোমার মাতৃকুল পরিচয়ও তুমি জান না। তুমি ঋষির অবহেলিত সন্তান হলেও···।

স্নেহময়ী জননীর চুম্বনস্পর্শে ঘুম ভেঙ্গে যায় রাবণের। মাতার অশ্রুস্পর্শে মুহূর্তে টুটে যায় তার তন্দ্রাজড়িমা। বসে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে মার মুখপানে। বুঝতে পারে অশ্রু গোপন করতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসনাঞ্চলে অশ্রু অবলেপন করেন মা।

তখনও বিহ্বল দৃষ্টিতে মার দিকে তাকিয়ে আছে রাবণ। সে দৃষ্টিতে অভিনবত্ব দেখতে পায় কৈকশী। তার অন্তর কেঁপে ওঠে। ধীরে ধীরে রাবণ বলে,—মা, আমি আর শিশু নাই, বালকও নই, কিশোর হয়েছি, সকলই দেখছি, সকলই বুঝতে পারি।—পুত্রের কণ্ঠস্বরে অভিজ্ঞ জনের সুর। চমকে ওঠে কৈকশী। রাবণ বলে চলে—মা, তোমার প্রতিদিনের জীবন আমার হৃদয়ে কণ্টক-ক্ষতজ্বালা বর্ষণ করে।

—ওষ্ঠে তর্জনী ঠেকিয়ে পুত্রকে চুপ করতে ইঙ্গিত করে কৈকশী।

রাবণ বলে,—আমি কি ভীরু, কাপুরুষ!

এক দারুণ প্রমাদের রব বেজে ওঠে কৈকশীর অন্তরে। সহসা রাবণের দেহে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দারুণ ক্ষতচিহ্ন দেখে আতঙ্ক-বিচলিত কণ্ঠে কৈকশী বলে ওঠে,—কোথায় কি বিভ্রাট ঘটিয়েছ বৎস! তোমার দেহে এতো ক্ষতচিহ্ন কেন?

—দেহের ক্ষতচিহ্ন সকলেই দেখতে পায় মা, মনের ক্ষতচিহ্ন নিজে ভিন্ন কেউ দেখতে পায় না, অনুভবও করতে পারে না।

—বয়স অনুপাতে কথা বল, বৎস। অপরিণত বয়সে পরিণতের মত কথা বলবে না।

—মানুষের বোধশক্তি বয়সনির্ভর নয় মা। রাজার নির্দেশে রাজরক্ষী প্রহরায় যখন দারুণ হুতাশন গ্রাস করছিল নিষাদপল্লী, তাদের আর্তক্রন্দনে বিচলিত হয়ে আমি তাদের রক্ষা করতে গিয়েছিলাম। আহত হয়েছি।

সর্বনাশ, এ যে রাজদ্রোহিতা!—অসহায়ের মত বিচলিত আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে কৈকশী।

—রাজা গণদ্রোহী হয়েছে, আর আমি শুধু রাজদ্রোহী হয়েছি। আমার অপরাধ লঘু।

—চুপ্ কর পুত্র। তোমার অমিত স্পর্ধা দুঃখের কারণ হবে।

তথাপি অবিচল চিত্তে রাবণ বলতে থাকে,—লুণ্ঠিত সম্পদ গিয়েছে রাজভাণ্ডারে আর গো সম্পদ এসেছে আমার পিতার আশ্রমে।

আর্তকণ্ঠে কৈকশী বলে ওঠে—চুপ কর পুত্র, চুপ কর। তুমি কি আমার মৃত্যু কামনা কর?—পুত্রের মনের দুর্বলতম কক্ষে আঘাত করে কৈকশী।

থেমে যায় রাবণ। তার মুখমণ্ডলে নেমে আসে এক গভীর বিষাদের ছায়া। বাষ্পায়িত হয়ে আসে তার দুই চক্ষু।

মাতার স্নেহকুটিরে তখনও ঘুমিয়ে আছে কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, শূর্পণখা—নির্মল, নিষ্পাপ। দূরে জাগ্রত বনপক্ষীর ক্ষীণ কলরব শোনা যায়। শেষ হয়ে এসেছে সন্তাপহারিণী তামসী রাত্রি। পুত্রের ক্ষতস্থানে ঔষধি তৈলের প্রলেপ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় কৈকশী। কুটির

অর্গল-উন্মুক্ত করে লতাকুঞ্জে এসে দাঁড়ায়। অদৃশ্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে।

—কার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলে, মা?

শুনে চমকে ওঠে কৈকশী। কিঞ্চিৎ রোষতিরস্কারের সুরে বলে,—তুমি অসুস্থ। তুমি এখানে এসেছ কেন, বৎস!

রাবণ নীরবে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। পুত্রের মনের কথা বুঝতে পারে কৈকশী। পুত্রের চিবুক স্পর্শ করে স্নেহচুম্বনে বলে, —বৎস, তুমি যতদিন চাইবে ততদিনই আমি জীবিত থাকব। তোমাদের ত্যাগ করে আমি স্বর্গে গিয়েও সুখ পাব না।

এক অপার আশ্বাস-আনন্দের আভাস ফুটে ওঠে রাবণের মুখ-মণ্ডলে। মাতার মুখ থেকে যেন এক নতুন জিজ্ঞাসার কথাও মন্ত্রধ্বনির মত শুনতে পায় রাবণ। প্রশ্নের জন্য তার সমগ্র অন্তর উৎসুক ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। সহসা তার অজ্ঞাতেই যেন মুখ থেকে স্খলিত হয়ে যায় দুটি কথা—স্বর্গ কি, আর নরকই বা কি মা?

পুত্রের প্রশ্নে বিব্রত বোধ করে কৈকশী। বড় জটিল এ প্রশ্ন। এ প্রশ্ন জীবনে কোনদিন বিশ্লেষণ করে নি সে। তার উত্তরও অনু-সন্ধান করে নি। বালখিল্য চপলতা বলে পুত্রের এ প্রশ্ন উপেক্ষা করলে পুত্রের জিজ্ঞাসু মন সন্তুষ্ট হবে না। মনে মনে উত্তর অন্বেষণ করতে করতে পুত্রের মুখের দিকে তাকায় কৈকশী। সহসা নিজের জীবনেই যেন উত্তর খুঁজে পেয়ে বলে,—সুখই স্বর্গ, দুঃখই নরক।

এই উত্তরের মধ্যেই যে তার জীবনের এক গুরুতর জটিলতা লুকিয়ে আছে তা ভাবতেও পারে নি কৈকশী। ক্ষণকাল নীরব ভাবনার পর রাবণ পুনরায় প্রশ্ন করে,—তাহলে বিমাতা দেববর্ণিনী আর পিতা ঋষি বিশ্রবা স্বর্গবাস করছেন আর তুমি বাস করছ নরকে? রাজা বাস করছেন স্বর্গে, নিষাদগণ বাস করছে নরকে?

অত্যন্ত বিচলিত ও বিব্রত বোধ করে কৈকশী। অন্তরের গভীরে এক দারুণ চঞ্চলতা বোধ করে। কোন উত্তর খুঁজে পায়

না। তার এই চঞ্চল-দুর্মদ পুত্র যেন তাকে এক দোদুল্যমান গভীর সঙ্কটের আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। পুত্রের সত্য সন্ধানের আকুলতা শান্ত করবার কোন পথও খুঁজে পায় না। পরাজিত মনে অসহায়ের মত উত্তর দেয়—পুণ্যবাণগণ স্বর্গসুখ ভোগ করে, আর পাপীগণ নরকের দুঃখ ভোগ করে।

কৈকশী ভাবতেও পারে নি তার এই উত্তর পুত্রের হৃদয়ে মার প্রতি সযত্নে লালিত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার কক্ষটিতে আঘাত করবে। চকিত আঘাতে অবিশ্বাসের সুরে রাবণ বলে ওঠে—অসম্ভব, অসম্ভব। তুমি কোন পাপ করতে পার না, মা। নিঃস্ব দুর্বল নিষাদগণও কোন পাপ করতে পারে না। সত্য বল, কে তোমাদের পাপ-পুণ্য নির্ধারণকর্তা? কে তোমাদের শাস্তিদাতা? কে এ সংসারের সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা? আমি তার সাক্ষাৎ চাই। আমিই তাকে শাস্তি দেব।

কৈকশী অনুভব করতে পারে ভয়ঙ্কর এক বজ্রানল যেন আত্ম-গোপন করে আছে পুত্রের ভাষায়। বিচলিত ত্রাসে বলে ওঠে—ন্যায়দণ্ডধারী ধর্মরাজ যম। ব্রাহ্মণ আর রাজা ভিন্ন সকলের বিচার তিনি করেন। বৃথা ক্রুদ্ধ হয়ে তুমি বিভ্রাটকে আমন্ত্রণ করো না। তুমি এখনও বালক, যথাবয়সে সকলই বুঝতে পারবে। তুমি এখন যাও, বৎস। আমার নিত্যকর্মের সময় সমাগতপ্রায়।

—'সুখ-দুঃখ', 'স্বর্গ-নরক', 'পাপ-পুণ্য', 'ধর্মরাজ বিচার করেন'—মাতার কথাগুলি আবৃত্তি করতে করতে সুগভীর চিন্তামগ্নতায় আবিষ্ট হয়ে পড়ে রাবণ।

পুত্রের চিন্তার তন্ময়তা লক্ষ্য করে কৈকশীর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। সেই ভাবতন্ময়তার মধ্যে রাবণ তখনও যেন অস্ফুট স্বগত পুনরাবৃত্তি করে চলেছে সেই কয়টি কথা—স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, বিচার করেন ধর্মরাজ। সহসা হৃদয়ের সমস্ত সঙ্কোচের কারাগার চূর্ণ করে দিয়ে কিশোর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়—সব মিথ্যা, শুধু মিথ্যা নয় প্রতারণা। আমি সমস্ত প্রতারণার আবরণ চূর্ণ করে সমস্ত ব্যবধান লোপ করে দেব।

মহাকালের চলার পথে বিরল একটা মুহূর্ত। এমনই বিরল মুহূর্তগুলিই খোদিত থাকে মহাকালের হৃদয়ে। ঋষি বিশ্রবার আশ্রমের লতাকুঞ্জে দাঁড়িয়ে দুটি অবজ্ঞাত প্রাণ, মাতাপুত্রের সংলাপ এক দুর্লভ ধ্বনির মত বাজতে থাকে কালের হৃদয়ে।

মেরুশীর্ষ তখন অরুণোদয়ের বার্তা ঘোষণা করছে। কৈকশীর বিচলিত মাতৃত্ব তখন পুত্রকে বক্ষে টেনে শির চুম্বন করে কানে কানে বলে,—বৎস, তুমি কিশোর, দুর্বল। যুবক হও, বল সঞ্চয় কর। বৃথা আস্ফালনে বিপর্যয়কে আহ্বান করো না।

—বালকের বাচালতা ক্ষমা করো, মা। এ আমার আস্ফালন নয় মা, এ আমার গোপন মনের প্রতিজ্ঞা—দুঃখীর দুঃখ মোচন করে স্বর্গ-নরকের ব্যবধান মুছে দেব আমি। আমি অন্তর দিয়ে বুঝি, তুমি কখনও কোন পাপ করতে পার না। নিষাদগণ পাপ করে নি।

—যাও বৎস, তুমি কুটিরে যাও। আমার অবগাহন কাল সমাগতপ্রায়।

* * *

নব উষার আলোক মাত্র স্ফুরিত হচ্ছে। রক্তিমাভায় রঞ্জিত হয়ে উঠছে পূর্ব দিগ্‌গগনের কপোল।

কৈকশী সম্মার্জনী সংঘাতে নির্মল করেছে আশ্রম অঙ্গণ। অবলেপনে পবিত্র করেছে মন্দির অঙ্গন। তারপর কুঞ্জকানন হতে পুষ্পচয়ন করে তরাগ-সলিল হতে অবগাহন শান্তি নিয়ে আশ্রমে ফিরে এসেছে! প্রস্তুত করেছে ঋষি বিশ্রবার পাদ্য অর্ঘ্য। রচনা করেছে পুষ্পপাত্র, পূজাউপাচার। পেতে রেখেছে ঋষিবরের সন্ধ্যা-বন্দনার আসন।

তপস্বিনী নয়। তবুও তার ভূষণহীন রুক্ষদেহে জীর্ণ বল্কল বসন দেখে মনে হয় যেন এক ক্ষান্তিহীন তপস্যার জীবন বহন করে নিয়ে চলেছে কৈকশী।

এই অশেষ-যৌবনা রূপলাবণ্যময়ী রমণীর দিকে তাকিয়েও কোনদিন ঋষিচিত্ত দ্রব হয় নি।

কোন সুদিনের প্রতীক্ষায় নিজের অন্তরকে মগ্ন করে রেখেছে কৈকশী। অথবা এই দুঃখের জীবনের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করে জীবনসমাপ্তির প্রতীক্ষায় আত্মসমাহিত হয়ে আছে। কখনও কখনও তার অন্তরের অন্তস্তলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস আলোড়িত হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিনের এই দীর্ঘশ্বাস। যুগাধিক কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেল এই দীর্ঘশ্বাস। অতীত স্মৃতিসাগরে সন্তরণ করতে করতে রোদনরুদ্ধ দীন অন্তরে কৈকশী অবশমনে ভাবে—তাঁদের বুঝি আর কোন দিনই দেখতে পাবে না। কোন সম্ভাবনাও বুঝি আর নেই। তাঁদের আত্মপ্রকাশ নিষিদ্ধ। তাঁদের কথাও বলা নিষিদ্ধ। মনে পড়ে, সেই বিদায়ক্ষণে অশ্রুসজল নয়নে তাঁরা চলে এসেছিলেন অনেক দূর। আত্মগোপনের গোপনীয়তা স্নেহের পথরোধ করে দাঁড়াতে পারে নি।—নিজ কুটির-অঙ্গনের সিন্ধুবার তরুছায়াতলে দাঁড়িয়ে নিবিড় দৃষ্টিতে কৈকশী তাকিয়ে থাকে সেই দিকে,—সেই দূর দিগন্তের পানে, যে-পথে সে এসেছিল। যেখানে আত্মগোপন করে আছেন তার স্নেহময় পিতামাতা। নিষ্ঠুর মেরু তার দৃষ্টিপথ রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকে।—নিষ্ঠুর ঋষির আশ্রয় হে নিষ্ঠুর মেরু, আমার হৃদয়ের পথরোধ করা তোমার সাধ্য নয়।

তাঁর মনোনিভৃতে এক গোপন ক্রন্দন যেন বলে ওঠে,—হে, রাক্ষসরাজ সুমালী, তুমি যদি দেখতে, তুমি যদি জানতে—তোমারই এক দৌহিত্র তোমারই মত দুর্মদ পৌরুষময় পুরুষ হতে চলেছে, তার কথা তোমারই মত রুদ্রময়,—এই নির্বাসনেও তোমার হৃদয় আশার আনন্দে আনন্দময় হয়ে উঠত। পিতা সুমালী, তোমার সেই ভাষা আজ তোমার দৌহিত্রের ভাষা হয়ে আমার প্রথম যৌবনের চিন্তাকে বিদ্রূপ করছে।

অকস্মাৎ ভেঙ্গে'যায় কৈকশীর স্বপ্নের আবেশ। লতাকুঞ্জের অন্তরাল থেকে দেখতে পায় আশ্রম অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছে এক স্বর্ণময় দিব্য

রথ। শ্বাপদ-তাড়িত মৃগযূথের মত ভয়ার্ত কৈকশেয়গণ দৌড়ে কুটির-অঙ্গনে মাতার আশ্রয়ে এসে দাঁড়ায়। আশ্রমের সর্বজন-তাড়িত অসহায় অবহেলিত সন্তানদের দিকে তাকিয়ে বেদনাদ্রব রোষে কৈকশী বলে—তোমরা সকলেই আমার ব্যর্থ জীবনের এক একটি বেদনা।

—পিতা তাড়না করেছেন।

কৈকশীর অন্তর বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে।

কুঞ্জকাননের লতাবেষ্টনী ভেদ করে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসে রাবণ। কণ্ঠে তার ক্ষোভ আর অভিযোগ।—মা, কে একজন রাজপুরুষ এসেছেন, সেই কারণে পিতা শূর্পণখাদিগকে লাঞ্ছিত করে ঐ স্থান থেকে বিতাড়িত করেছেন, যেন আমরা তাঁর কেহ নই। রাক্ষসী বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করেছেন। পিতার কণ্ঠে ছিল আমাদের প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা। এ অতিবড় অন্যায় মা। এ যেন তোমার প্রতি এক অসহনীয় অসম্মান।

লজ্জার আঘাতে বেদনাময় হয়ে ওঠে কৈকশীর বদন মণ্ডল। তারপর অপমানরুদ্ধ কণ্ঠে বলে,—কে ঐ রাজপুরুষ জান তুমি, বৎস?

অবিচলিত কণ্ঠে রাবণ বলে,—তিনি যেই হোন মানুষ বটে। আমরাও মানুষ, ঋষি বিশ্রবার সন্তান!

—তিনিও ঋষি বিশ্রবার সন্তান। তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। দেববর্ণিনীর পুত্র—কুবের। চতুর্থ লোকপাল, ধনপতি কুবের। তুমি কি তাঁর সমকক্ষ হতে পারবে, বৎস!

—আমরাও তো ঋষি বিশ্রবার সন্তান। কৈকশী আমাদের জননী। তবে কেন পিতার এত অসমদর্শিতা? কেন এত অবজ্ঞা? তিনি চতুর্থ লোকপাল ধনপতি বলে? তাই এত বিসদৃশ সঙ্কীর্ণতা? আমি তোমার চরণস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি মা,—আমি তোমার ঐ সপত্নী-পুত্রের শুধু সমকক্ষই নয়, তাঁকে অতিক্রম করব। মনে করো না মা, এ তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র চপলমতি রাবণের উচ্চ আস্ফালন মাত্র! এই অবজ্ঞা, অন্যায়, অবিচার প্রবল দাহিকাশক্তি হয়ে আমার ধমনী-

ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। এই বেদনায় আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। প্রতিজ্ঞা করছি মা, আমি তোমার বদনে আনন্দ হাস্য স্ফুরিত করব। আমার স্মরণ আছে মা,—সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক আর তোমাদের ন্যায় বিচারক ধর্মরাজের কথা। আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি মা, তোমাদের সমাজের এই সমস্ত প্রতারণাময় কৃত্রিম ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে স্বর্গের সোপান রচনা করে দেব। সর্বজনের সুখকর এক সমদর্শিতার সাম্রাজ্য স্থাপন করব।

বর্ষাগমে চৈত্রচাতকীর মত এক আশার শিহরণ জাগে কৈকশীর অন্তরে। সজল অন্তরে এক অদৃশ্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নীরবে প্রণতি জানিয়ে বলে,—আশীর্বাদ করি বৎস,—সফল কর তোমার প্রতিজ্ঞা। তোমার সাফল্য দেখতে আমরণ প্রতীক্ষা করে থাকব।

॥ ৩ ॥

সেদিন প্রত্যূষে, তখনও কৈকশীর নিদ্রাজড়িমা ভাঙ্গে নি, হস্তাবলেপে আঁখিপত্র বিমোচিত করে তাকিয়ে দেখে তার চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে এক চরম বিস্ময়। বাস্তবিকই ত্রিভুবনের সমস্ত বিস্ময়কে পরাভূত করে তারই জীবনের সমস্ত বেদনা যেন অদ্ভুত এক শঙ্কার রূপ নিয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তার হৃৎপিণ্ডের সমস্ত স্পন্দন স্তব্ধ করে দিতে। সমস্ত অবিশ্বাস আর অসম্ভবের প্রাচীর চূর্ণ করে দিয়ে বাস্তবিকই স্নেহের রাবণ পরিব্রাজকের বেশ ধরে এসে দাঁড়িয়েছে বিদায় নিতে। অনুগামী হয়েছে কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ। বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করা সম্ভবও নয়, তবুও সত্য। এক নিষ্ঠুর সত্য এসে আঘাত করছে তার মাতৃহৃদয়ের কোমল কক্ষে। নির্মমের মত বলছে,—মা, বিদায় দাও। আমার জীবনের ব্রত আরম্ভ করব। তপস্যা করব, সাধনা করব।

দারুণ এক ক্রন্দনের রোল ওঠে কৈকশীর বক্ষপঞ্জরে। আঁখি-বাষ্পে রুদ্ধ হয় দৃষ্টিপথ। কৈকশীর কল্পনায় চাওয়া-পাওয়া যেন আজ মাতৃহৃদয়ের কক্ষদ্বারে নিদারুণ এক সত্য পরীক্ষার রূপ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সংশয়-শঙ্কাজড়িত ভগ্নকণ্ঠে মা কৈকশী বলে, কোন্ ব্রত? কিসের তপস্যা, সাধনাই বা কিসের? জননীর অন্তরের বেদনা কি তুমি উপলব্ধি করতে পেরেছ, বৎস?

—মা, তোমার নীরব বেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেই তো আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। ভুলে যেও না মা, আমি তোমার পাদস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছি।

কৈকশী ভাবতেও পারে নি, তার এই যন্ত্রণা-জীবন কী ভয়ানক দুঃসাহসী করে তুলতে পারে একটা অর্বাচীন কিশোর হৃদয়কে। কোন্ স্নেহ, কোন্ ভয় প্রতিবোধ করতে পারে, প্রতিহত করতে পারে

এই কিশোর হৃদয়ের দুঃসাহসী উদ্যমকে?—বৎস, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে, বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করবে। সে প্রতিজ্ঞায় মাতৃদুঃখ মোচনের অঙ্গীকার কোথায়?

বিস্ময়াবিষ্ট বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে রাবণ। সত্যই তো, সে প্রতিজ্ঞায় মাতৃদুঃখ মোচনের কোন শব্দ ছিল না। যদিও সে কথার উৎসমূল ছিল মায়ের বেদনার প্রতি সমবেদনার আবেগ। এ আবেগ সুপ্ত হলেও সত্য। বাক্যে অপ্রকাশ থাকলেও হৃদয়ের আকাশে ছিল সদা প্রকাশমান।

মা কি তবে পুত্রের কথা বুঝতে পারে নি,—মা, তুমি কি আমার হৃদয়ের ভাষা বুঝতে পার নি?

কৈকশীর পুষ্প-সুন্দর ওষ্ঠে ঈষৎ ম্লান হাস্যের সঞ্চার হল। মনে মনে ভাবে—চপলমতি বালক বিস্মৃত হয়ে গেছে মাতার বদনে হাস্যস্ফুরণের প্রতিজ্ঞা। তারপর অপত্য স্নেহবিগলিত মধুর স্বরে বলে,—বৎস, আমি তোমার জননী। তুমি আমার দেহের বস্তু, মনের মন, অন্তরের অন্তর। আমার জীবনের বহু কামনার কল্পনা দিয়ে তোমাকে রচনা করেছি। আমি তোমার হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব না করতে পারলে, আর কে পারবে বল।

—তবে?

—কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছতে, কোন্ ব্রত গ্রহণ করে কোন্ পথে অগ্রসর হতে চলেছ সে সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান, সম্যক উপলব্ধি তোমার হয়েছে কি?

অজ্ঞতার অন্ধকারে পথ খুঁজে পায় না রাবণ। বিহ্বল দৃষ্টিতে মাতার স্নেহচক্ষুর দিকে তাকায়।

—বৎস, আবেগ আর উচ্ছ্বাস অন্তরের একটা ভাসমান গুণ, তার মূল লুকিয়ে থাকে অন্তরের অন্তস্থলে। মেধা দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে তা উপলব্ধি করতে হয়। শুধু তোমার মায়ের ভাগ্যই অবজ্ঞায় লাঞ্ছিত হয়ে নীরবে কাঁদছে না, কাঁদছে ত্রিভুবনে আরও শত সহস্র মাতৃহৃদয়। শুধুমাত্র একটা নিশাদ পল্লীই চরম নির্যাতনের শিকার

হয় নি, ত্রিভুবনে ছড়িয়ে আছে এমনই শত শত নিষাদ পল্লী যারা অসহায়। আর্ত হাহারব ভিন্ন যাদের আর কোন সম্বল নেই। কোন বীর, ত্রাতার মত তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় না। শুধু তোমার পিতাই নন, সমস্ত আর্য জাতির কাছে তাদের জাতি-শোণিতই বড়, আর সব অধম।

অসম্ভব একটা জ্বালাদ্যুতি ফুটে ওঠে রাবণের চক্ষুতে। তার দেহ থেকে যেন নিঃসৃত হতে থাকে অনল ধূমের মত ধোঁয়া। হৃৎ-পিণ্ডের ভিতরে একটা দারুণ চাঞ্চল্য বোধ করে সে। হৃদয়ের সমস্ত দূর্বলতাকে ভ্রূকুটি করে বলে ওঠে,—সমাজের কল্যাণ সাধনার ব্রতই আমি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করছি, মা। আমি এক বিরাট কল্যাণ যজ্ঞের যাজ্ঞিক হতে চাই।

—বৎস, উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, লক্ষ্য যতই পবিত্র হোক, নিজের হৃদয় মহৎ ও উদার না হলে, নিজে পবিত্র না হলে সফল হওয়া যায় না। লক্ষ্যপথের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি না থাকলে সার্থকতা লাভ করা যায় না। মেঘাবৃত আকাশ থেকে ভাস্করের দ্যুতি যেমন মানব-কল্যাণ করতে ব্যর্থ হয়, তেমনই কলঙ্ককালিমালিপ্ত হৃদয় লোকহিত ব্রত সাধন করতে ব্যর্থ হয়। বৎস, তুমি জ্ঞান অর্জন কর, শক্তির সাধনা কর, মহত্ত্বের তপস্যা কর। আমি তোমার মহৎপথের কণ্টক হব না। তোমাদের বিদায় দিলাম। মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ উৎসারিত করে আশীর্বাদ করি,—তুমি সার্থক হও। দিনান্তে একবারও অন্তত স্মরণ করো মা আর ভগ্নীর কথা।

নবারুণের রক্তরাগ তখনও মেরুশির রঞ্জিত করে তোলে নি। জলনলিনীর অধর তখনও শশধর ওষ্ঠস্পর্শচ্যুত হয় নি। বনপক্ষীরা জেগেও নীড় ছাড়ে নি। জেগেও ছাড়ে নি দেববর্ণিনী ঋষির বাহু-বেষ্টন। এমনই সন্ধিবেলায় ঋষি বিশ্রবার রাক্ষস পুত্রগণ অনাথের মত ছেড়ে গেল আশ্রম। পিতার স্নেহ সম্ভাষণ নয়, মঙ্গলমন্ত্র নয়, শুধু মাতার অশ্রু আর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে চলে গেল তারা। স্নেহ-সজল নয়নে এগিয়ে গেল কৈকশী। প্রত্যূষের ক্ষীণ অন্ধকারে যতদূর

দৃষ্টি যায় কৈকশী তাকিয়ে থাকে সেই দিকে। ঠিক যেন রসাতল থেকে সেই প্রথম বিদায়ের দিন। অশ্রুমোচন করে কৈকশী। এ এক চিরন্তন মাতৃত্বের পুনরাবৃত্তি।

* * *

নীলাঞ্জন কান্তি কিশোর, যেন নবীন এক নীলাশোক। অতিক্রম করে চলে গেল সিদ্ধচারণ-সেবিত মেরুকটির নীলচ্ছায়াঘন কানন। বয়সে কিশোর কিন্তু দেখলে মনে হয় যেন এক নবীন যুবা। তার মৃগেন্দ্র পদক্ষেপে অঙ্গে তরঙ্গিত হয় যৌবন। তার স্ফীত বক্ষের অন্তরালে গোপন করে চলেছে যেন গরুড়ের প্রতিজ্ঞা। যেন এক রুদ্ধতেজ আগ্নেয়গিরি আপন অন্তরের জ্বালায় মর্তভূমিটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে নতুন কি যেন একটা গড়তে চায়। পৃথিবীটাকে কোন্ রূপে গড়তে হবে তা বুঝে উঠতে পারছে না, তাই এত জ্বালা। তাই অস্থির হয়ে যেন মর্তভূমিটাকে মথিত করে এগিয়ে চলেছে। অনুগমন করছে যেন দুইটি প্রতিবিম্ব।

অতিক্রান্ত হয় দিবস-রজনী-মাস-বর্ষ। অতিক্রম করে সে কত লোকালয়-জনপদ, পর্বত-স্রোতস্বিনী, কানন-প্রান্তর-বনানী, কতশত নিষাদ পল্লী। আর ক্রুদ্ধ তেজে রুদ্ধ আবেগে সে কান পেতে শুনেছে লোকালয়ে, জনপদে, শত শত গৃহকোণে, মাতৃহৃদয়ের গোপন ক্রন্দন। শুনেছে সে শত শত নিষাদ পল্লীর লক্ষ নিপীড়িতের আর্তনাদ।

ব্রহ্মচারী নয়, তবুও তার হাতে ব্রহ্মদণ্ড। মোক্ষলাভের পথিক নয়, তবুও সে পরিব্রাজক। একটা অভিনব সাধনপথের পথিক, জ্ঞানার্থী, শক্তি-সন্ধানী পরিব্রাজক। তাঁর কৌষেয়বসন বিন্দু বিন্দু ধুলিকণায় মলিন। তপঃক্লিষ্ট মুখে প্রতিবিম্বিত হয় তার সেই কঠিন প্রতিজ্ঞা।

জ্ঞানার্থী শক্তিসন্ধানী কৈকশেয় রাবণ দেখছে আর মর্মে মর্মে অনুভব করছে, প্রতারণা-প্রিয় ভ্রষ্টাচারী, দুরাচারী আর্যরাজা আর

ব্রাহ্মণের স্বার্থবাহী উৎপীড়ণ-জর্জর, দুঃখদীর্ণ, জরাজীর্ণ এক মুমূর্ষু পৃথিবী। যার আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে আছে অত্যাচারিতের দীর্ঘশ্বাসে আর আর্তের অসহায় ক্রন্দনে। দেখছে এই মুমূর্ষু ত্রিভুবনের বক্ষে প্রতারণার উল্লাস নৃত্য আর বঞ্চনার অট্টহাসি। দেখছে আর মর্মে মর্মে অনুভব করছে, শক্তি আর সম্পদের স্বার্থে রচিত সংহিতা আর প্রতারণাময় ধর্মদণ্ডের শাসনে নিষ্পিষ্ট একটা মৃত পৃথিবী। দেখছে, সুখ আর স্বর্গ বন্দী হয়ে আছে সম্পদ আর শক্তির কারাগারে। —কিন্তু মুক্তির পথ ?

উদ্‌ভ্রান্তের মত সেই পথের সন্ধানে পরিব্রজ্যায় অতিবাহিত করে চলেছে সে কত দিবস-রজনী, শীত-গ্রীষ্ম, শরৎ-বসন্ত। অতিক্রম করে চলেছে দেশ দেশান্তর। জানে না সে, সাধনায় তুষ্ট হয়েছেন কিনা প্রজাপতি ব্রহ্মা। চলেছে তারা হৃষ্টমনে উত্তরদিগ্‌দেশে গোকর্ণ আশ্রমের অভিমুখে পিতামহ ব্রহ্মার আশীর্বাদপুষ্ট হতে। দুঃসহ বোধ হলেও একটা আশা অন্তরে লালন করে চলেছে। একটা নতুন পৃথিবী গড়তে হবে, এই আশা।

পশ্চিম দিগন্তে অপরাহ্নের আকাশ হতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে ক্লান্ত দিনের সৌরকরপ্রভা। শান্ত চিতানলদ্যুতির মত সন্ধ্যাকাশে ফুটে উঠতে থাকে রক্তরাগ। সামনে ঘোর অরণ্য। এক সিন্ধুবার তরুতলে এসে থমকে দাঁড়ায় রাবণ। স্নেহদৃষ্টিতে তাকায় কনিষ্ঠদের দিকে। সে দৃষ্টিতে ভয়ের কোন চিহ্ন নেই, নেই কোন আবিলতা। জিজ্ঞাসা করে,—সম্মুখে বিস্তৃত অরণ্য, সায়ংকাল সমাগতপ্রায়, তোমাদের অভিপ্রায় জানাও।

—জ্যেষ্ঠ, হুতাশন কি কখনও অরণ্য দেখে ক্ষান্ত হয়। আমরা দাবানল হয়ে প্রবেশ করব সম্মুখের ঐ অরণ্যে—কুম্ভকর্ণের বচনে তৃপ্ত হয় রাবণ। কিন্তু বিভীষণের ম্লান বদনে বিচলিত হয়।

সহসা কোন অলক্ষ্য থেকে কঠোর সাবধান বাণী শুনে উচ্চকিত হয়ে ওঠে তারা। —কে তোমরা মূর্খ, অর্বাচীন, অহঙ্কারী শিশু-সর্পের মত নিজ বিষের জ্বালায় উদ্‌ভ্রান্তের মত এগিয়ে চলেছ নকুল-

বিবরের অভিমুখে? কে কবে মৃত্যুর আলয়কে নিজ আলয় বলে ভ্রম করেছে? ক্ষান্ত হও।—বলে লতাবল্লী ভেদ করে এগিয়ে এলেন এক সুদর্শন ব্রাহ্মণ।

—অভিবাদন গ্রহণ করুন।—বলে রাবণ সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ব্রাহ্মণের দিকে। যেন আদিত্যদ্যুতির মত জ্ঞানদ্যুতি স্ফুরিত হচ্ছে ব্রাহ্মণের নয়নযুগলে। . অতি প্রশান্ত বদনমণ্ডল। অথচ এই প্রশান্তির মধ্যে মিশে আছে চকিতপ্রভা।

—বৎস, অসম সাহস পুরুষের প্রশংসনীয় গুণ সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃসাহসিকতা প্রশংসনীয় নয়। দুঃসাহস মূর্খতা মাত্র। কোন্ দুঃখে তোমরা অসময়ে ঐ মৃত্যুবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছ? তোমাদের উজ্জ্বল মুখশ্রী দেখে মনে হয় কোন সম্পন্ন গোত্রের সন্তান। তোমরা অসহায় ও নিরাশ্রয় বোধ করলে আমার আতিথ্য গ্রহণ করতে পার। প্রভাতে আমি তোমাদের ঐ ভয়াবহ মৃত্যুবন অতিক্রমের সরল ও নিরাপদ পথ নির্দেশ করে দেব।

অভিভূত হয়ে পড়ে রাবণ। পিতার স্নেহবচন তাদের অজ্ঞাত। জানে না পিতৃস্নেহের বচনে এমনই মধুর আকর্ষণ থাকে কিনা। মুক-বিস্ময়ে আগের মতই নীরবে তাকিয়ে থাকে সে।

—বৎস, দ্বিধা নিরর্থক। মনুষ্যত্ব আর মমতার লেশমাত্রটুকুও যদি কাহারও অন্তরে থাকে তাঁর পক্ষে তোমাদের ন্যায় কিশোর কুমার-দের মৃত্যুর গহ্বরে নিক্ষেপ করা সম্ভব নয়।

দুর্লভ এক স্নেহের স্পর্শে বিচলিত কণ্ঠে রাবণ বলে,—বিপ্রশ্রেষ্ঠ, আমরা বৈশ্রবান। মাতা আমাদের রাক্ষসনন্দিনী কৈকশী।

শুনে চমকে উঠে বিস্ময়াবিষ্টের মত ব্রাহ্মণ তাকিয়ে থাকে রাবণের দিকে।

—ব্রাহ্মণোত্তম্……।

—আর পরিচয়ের প্রয়োজন নেই, বৎস। কি দুঃখে তোমরা আশ্রম ত্যাগ করেছ?

—দ্বিজোত্তম, কোন পুত্র, সে যদি হীনবীর্য কাপুরুষ না হয়, তবে

সে কি কখনও মাতার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, অবজ্ঞা সহ্য করতে পারে? কোন মানুষ, তার যদি সামান্যতম মনুষ্যত্ব থাকে, নিঃস্ব দুঃখীজনের প্রতি শক্তিমানের নির্মম অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে পারে?

—যথার্থ। কিন্তু কি করতে চাও তুমি?

—ভগবন! ত্রিভুবনে আমি এক সমদর্শিতার নীতি প্রবর্তন করতে চাই। যে সমাজে আর্য পিতা ঘৃণা করবে না অনার্যা মাতা আর তার সন্তানদের। কোন আর্যই ঘৃণা করবে না কোন অনার্যকে। রাজা করবে না প্রজাপীড়ন। নিঃস্ব, দরিদ্র নিষাদগণও লাভ করবে রাজা আর ব্রাহ্মণের কাছ থেকে সমদৃষ্টি। আমি সর্বজনের সমসুখের জন্য স্বর্গের সোপান রচনা করে লোকহিতব্রত উদ্‌যাপন করতে চাই। ভগবন, অন্তরের তীব্র জ্বালায় প্রব্রজ্যাব্রত গ্রহণ করে জ্ঞানান্বেষণে ব্রতী হয়েছি! তপস্যা করছি, সাধনা করছি, কিন্তু আমার দৃষ্টিপথে কোন স্বচ্ছ পথ দেখতে পাচ্ছি না।—বনবৈশাখের আনন্দরোল যেন কলরব করে উঠল। রাবণের কথায় ক্ষীণ হাস্যের সঞ্চার হয় ব্রাহ্মণের ওষ্ঠসন্ধিতে। সন্ধ্যাকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবেন,—বালকের বুদ্ধি অপরিণত হলেও হৃদয় মিথ্যা নয়। শুধু কল্পনাও নয়। শুধু আবেগও নয়। উদ্যম নিরর্থক নয়। দৃঢ়মূল বিশ্বাস নিয়ে অসম সাহসিকতায় এগিয়ে চলেছে সিদ্ধিলাভের পথে। হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে এই বেদনাবিড়ম্বিত অসম সমাজকে।

মৃদুহাস্যে হৃদয়ের প্রসন্নতা মুক্ত করে দিয়ে ব্রাহ্মণ বলেন—বৎস, একটি বা দুইটি ঘটনা, একটি বা দুইটি ভাবকে অবলম্বন করেই হৃদয়বান মানুষের হৃদয় ছড়িয়ে পরে বহুতে। সমচরিত্র, সমভাব ছড়িয়ে আছে সারা ত্রিভুবনে। তুমি তোমার ভাবকে প্রসারিত করে ছড়িয়ে পর বহুতে, ত্রিভুবনে। দৃশ্যমান সমস্ত অবস্থা বা ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত মৌল কারণ একই। বৎস, দেহের একটি স্ফোটকই দেহের অভ্যন্তরে নিহিত দূষিত রক্তের বহিঃপ্রকাশ। বাহ্য ঔষধ

প্রলেপে ক্ষণস্থায়ী নিরাময় সম্ভব হলেও স্থায়ী নিরাময় সম্ভব নয়। স্থায়ী নিরাময়ে, ধমনীতে পরিস্কৃত রক্তপ্রবাহ ঘটানোই সঠিক পথ।

রাবণের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় উচ্ছ্বাস।—হে দ্বিজোত্তম, আপনি আমার আন্তরিক সহস্র প্রণিপাত গ্রহণ করুন। আমি অনুজগণ সহ শক্তি-সন্ধানে তপস্যা করতে যাচ্ছি গোকর্ণ আশ্রমে। তৎপূর্বে জ্ঞানানুসন্ধানে পরিব্রজ্যা ব্রত পালন করছি। হে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, আমার কতগুলি প্রশ্নের আজও কোন সদুত্তর পাই নি। আমার জননীও উত্তর দিতে সংশয়ান্বিতা ছিলেন।—সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিধি-বিধান কে রচনা করেছেন? ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকের নির্ধারণকর্তা কে? মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, বৈষম্য, অসম দৃষ্টির প্রাচীরের রচয়িতা কে?

—বৎস, এই প্রশ্নগুলিই আমার চিন্তার ভিত্তি। এ প্রশ্নগুলির সৎসমাধানের জন্যই আমার সাধনা। বিচার-বিবেচনা আর যুক্তি বর্জন করে অন্ধবিশ্বাসনির্ভর গতানুগতিক পথে চলাকে আমি মনে করি, নিজ চিন্তা ও বুদ্ধিকে পরাধীন করা। একথা নিশ্চিত সত্য যে, সমাজশাসন সংহিতা, রাষ্ট্রশাসন সংহিতা রচনা করেছেন ক্ষমতাবান সম্পন্নগণ আর শক্তিমান রাজন্যবর্গ, নিজ নিজ স্বার্থে। পূর্বজন্ম-পরজন্ম অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অব্যক্ত। ব্যক্ত ইহজন্মই মুখ্য। নিজ নিজ ক্ষমতা আর সুখভোগ নিরঙ্কুশ করতে স্বার্থবাদীগণ সমাজ ও শাসন সংহিতা রচনা করেছেন। চতুর লোকের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থে আছে—যজ্ঞ কর, দান কর, তপস্যা কর, ত্যাগ কর ইত্যাদি। এর উদ্দেশ্য কেবল জনসাধারণকে বশীভূত করা। এ সকলই প্রতারণা। সম্পন্নদের সংবিধানে সকল বঞ্চিতরাই পাপী, আর বঞ্চকরাই পুণ্যবান। দুঃখে দৈন্যে কষ্টে বাসই নরকবাস। আর সুখে-স্বচ্ছন্দে বাসই স্বর্গবাস। বৎস, সৃষ্টির আদিতে এই পার্থিব সংসারে ভেদাভেদ ছিল না। সমদৃষ্টি ছিল। মনুষ্যসমাজে সকলেই সমভোগের অধিকারী ছিল।

রাবণের বক্ষপঞ্জরের অন্তরালে গভীর গোপনে সঞ্চিত একটা বেদনার অনুভব যেন সত্যের স্পর্শে ফুটে উঠতে থাকে। একটা

গোপন হর্ষ অনুভব করে সে। তবুও একটা সংশয় যেন গোপনে গুঞ্জন করতে থাকে,—সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে যে আর্য ব্রাহ্মণ সে কি কোন ছলনা, না কোন অভিসন্ধি, আমার সকল তপস্যার পুণ্য ও আনন্দ বিনাশ করবার জন্য এই সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়েছে! অতি সতর্কে প্রশ্ন করে,—ভগবন! আমার ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন। আপনার পরিচয়?

—ব্রাহ্মণ জবালী।

শুনে চম্‌কে ওঠে রাবণ। একটা আশ্বাসের সলিলধারা যেন তাঁর মেরু শিরায় বয়ে যেতে থাকে। —ভগবন, আপনার নাম আমি শুনেছি।

—আর কিছু শোননি?

—শুনেছি, আপনি নাস্তিক।

—হ্যাঁ, প্রতারণার অবলম্বন হিসাবে আমি ঈশ্বরকে জানি না। মানুষকেই আমি ঈশ্বর বলে জানি। সকল জীবকেই জানি ভগবান বলে। যাঁরা মানুষকে সম মর্যাদা দেয় না আমি তাঁদেরকেই ঈশ্বরদ্রোহী নাস্তিক বলে মনে করি। যাঁরা নিম্নবর্ণের মানুষকে পশুর অধিক মর্যাদা দেয় না, স্বীয় শ্রেণীস্বার্থ সাধনে যাঁরা মানবতাকে নিষ্পিষ্ট করতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধও করে না তাদেরই আমি ধর্মদ্রোহী বলে মনে করি।

—শুনেছি আপনি আচার-ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ।

—যথার্থই শুনেছ, বৎস। এ সকলই আমার বিরুদ্ধে প্রচার। প্রতারক আর ভ্রষ্টাচারীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার। আমি মিথ্যা জাত্যভিমানের সঙ্কীর্ণতাকে ঘৃণা করি ও সর্বপ্রযত্নে পরিহার করে চলি বলে, আমি সমাজের মিথ্যা আচার দম্ভের কলুষতাকে ও সর্ব প্রকার অন্ধবিশ্বাসকে ক্ষুরধার যুক্তির আঘাতে খণ্ডন করি বলে তাঁরা আমাকে আচার-ভ্রষ্ট বলে। আর আমি তাঁদের বলি ভ্রষ্টাচারী। আমার যুক্তিজাল ছিন্ন করতে অক্ষম বলে তাঁরা আমাকে বলে নাস্তিক—চারুবাক্। বৎস, মানবতার ধর্মই আমার ধর্ম। সর্বপ্রকার অন্যায়,

অনাচার আর ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামই আমার জীবন-বেদ। আরও কিছু কি শুনেছ?

—হ্যাঁ ভগবন! শুনেছি, আপনি সুযোগ বুঝে আস্তিকও হন।

—সেকথাও তাঁদেরই কথা। আমার কথা যখন দুরাচারীদের স্বার্থ-হানি করে না, দুরাচারীরা কখনও কখনও যখন মঙ্গলকর্মের অনুষ্ঠান করে তখন আমি তা সমর্থন করি, তখন তারা আমাকে বলে আস্তিক। আমার তীক্ষ্ণ সমালোচনার যুক্তি স্তিমিত করবার উদ্দেশ্যে স্তোকবাক্যে তারা আমাকে বলে ব্রাহ্মণোত্তম।

ক্রুদ্ধ অজগরের নিঃশ্বাস-বায়ুর মত ব্রাহ্মণোত্তম জবালীর অন্তর-ক্রোধের নিঃশ্বাস বায়ু আলোড়িত করে তোলে নির্জন বনস্থলী। বিচলিত হয়ে ওঠে রাবণ। সে বিনয় বচনে বলে,—ভগবন, আপনি নরশ্রেষ্ঠ। এক মোহময় সংসারের আবর্তে উৎসারিত আমার জিজ্ঞাসা আপনাকে ব্যথিত করেছে বলে আমি দুঃখিত। মার্জনা ভিক্ষা করছি।

নিতান্ত অর্বাচীন বালকের বচনে একটা নির্মল হাস্য স্ফুরিত হয় ব্রাহ্মণের বদনে, যেন সন্ধ্যাবায়ুর মৃদু শীতসঞ্চারে শান্ত হয় অগ্নিজ্বালার বিভীষিকা। তিনি স্নেহবচনে বলেন,—বৎস, আমার ক্রোধ প্রতারকদের উপর। তোমার বচনে আমি প্রীত। তোমার অন্তরের আশা আমার অন্তরে হর্ষের সঞ্চার করেছে।

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে আসে বনাঞ্চলে। দেখে মনে হয় সন্ধ্যার অন্ধকারে যেন চারিটি নিশ্চল মূর্তি দাড়িয়ে আছে সেখানে। বহু অবিন্যস্ত প্রশ্ন এতদিন যে জটিলতা রচনা করেছিল রাবণের মনে তা যেন এই মুহূর্তে হারিয়ে গেছে। অথবা, বুঝতে পারছে না সে সেগুলির মীমাংসা হয়ে গেছে কিনা। কিছুই বুঝতে না পেরে প্রশ্নাকুল দৃষ্টি তুলে নীরবে শুধু তাকিয়ে থাকে সে। সেই নৈঃশব্দ ভেঙ্গে ব্রাহ্মণোত্তম বলেন,—বৎস, তুমি তোমার মহৎ লক্ষ্যপথে অগ্রসর হও। সত্য যে, পূর্বেও গণশাসন ব্যবস্থা ছিল। তাতে সাধারণ প্রজাপুঞ্জের সমাজে ভোগের ব্যবস্থাপনায় অধিকার ছিল। অবশ্য যদিও সকলে সম-সুখভোগ করত না, সম্পন্ন ও দরিদ্রে সুখ-

ভোগের পার্থক্য ছিল। তথাপি দাবীর অধিকার ছিল। উদারতাও ছিল। ধীরে ধীরে রাজতন্ত্র এসে গণতন্ত্রের সেই অধিকারের অঙ্গন হরণ করে নেয়, সঙ্গে হরণ করে নেয় সামান্য সেই সুখভোগের সুযোগ পর্যন্ত। অবশ্যই তোমার চিন্তায় অভিনবত্ব আছে এই যে, সর্বজনের কল্যাণে, সমসুখভোগে, 'স্বর্গসুখের সোপান রচনা।' এ এক অত্যাশ্চর্য নীতি। তবে পথ বন্ধুর, দুস্তর ও কণ্টকাকীর্ণ। অশেষ সুখভোগী রাজতন্ত্রী, সম্পন্ন আর ঋষিপ্রতিম-পরশ্রমভোগীরা হবে তোমার পরমশত্রু। তথাপি সত্যপথে পশ্চাৎপদ হওয়া কাপুরুষতা!

শুনে প্রতিজ্ঞার আবেগে শিহরিত ওয়ে ওঠে রাবণের নয়ন। কল্পনার আনন্দে বাষ্পসিক্ত হয়ে ওঠে তাঁর চক্ষু। অন্ধকারে সমাহিত মূর্তির মতই দাঁড়িয়ে থাকে সে। সে যেন তাঁর জীবনের বিশ্বাসের জয়ধ্বনি শুনতে পায়। আত্মবিশ্বাসের আনন্দ অনুভব করে। ধীরে ধীরে সে জিজ্ঞাসা করে,—ভগবন, সমাজে সুখ-দুঃখের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে, স্বর্গের সোপান রচনা কি সার্থক হবে?

—তোমার মাতার দুঃখ ঘোচাতে যদি তুমি সমর্থ হও, তোমার ঐ নিষাদ-পল্লীর দুঃখীদের দুঃখ ঘোচাতে যদি তুমি সমর্থ হও তবে আরও শক্তি সঞ্চয় করে বহুজনের দুঃখ ঘোচাতে তুমি কেন সমর্থ হবে না বৎস। যে সমদর্শিতার নীতি তোমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছে সেই নীতিই তোমার স্বর্গের সোপান রচনায় সহায়ক হবে।

দিবসের ক্লান্ত সূর্য তখন আত্মগোপন করেছে পশ্চিম দিগন্তের অন্তরালে। নিশীথিনীর কৃষ্ণ কেশ আলুলায়িত হয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে বনভূমি। নিঃশব্দ বনসন্ধ্যার কণ্ঠ থেকে যেন উৎসারিত হচ্ছে,—দ্বিজোত্তম জবালী, তোমার হৃদয়ের বাণী মূর্ত হয়ে উঠুক ঐ বালক রাবণের জীবনের কর্মধারায়। সে একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায় তপস্যা করছে। ব্রাহ্মণের হৃদ্‌স্পন্দনের ছন্দে ছন্দে যেন এই বনভূমির কথাটাই ছন্দিত হচ্ছে। একটা অনুচ্চ দীর্ঘশ্বাসের সাথে জবালী বলেন,—বৈশ্রবনগণ! নিশি সমাগত, তোমরা আমার আতিথ্য গ্রহণ করে কৃতার্থ কর। কাল প্রভাতে আমি তোমাদের

গোকর্ণ আশ্রমের সরল পথ নির্দেশ করব। —বলে ব্রাহ্মণোত্তম জবালী আপন আলয় অভিমুখে চলতে থাকেন।

পথ চলতে চলতে এক অপার আগ্রহের চাঞ্চল্যে রাবণ বলে,—ভগবন, ত্রিভুবনের সকলই আপনার সুপরিজ্ঞাত। আমার মাতৃকুল পরিচয় জানতে আমি আগ্রহী। জানতে ইচ্ছা করে সেই অন্ধকারের ইতিকথা। জানা প্রয়োজনও আছে।

কিঞ্চিৎ নীরবতার পর জবালী বলতে থাকেন,—বৎস, সেই দীর্ঘ দুঃখের ইতিহাসের প্রয়োজনীয় অধ্যায়টুকুই তুমি জেনে নাও।—সম্পদলোভীগণ অন্যায় সমরে তোমার মাতামহ সুমালীকে পরাস্ত করে শ্রীলঙ্কার সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করেন। সেই থেকে সুরু হয় তোমার মাতা আর মাতামহের দুঃখের দিন। তোমার মাতামহের সেই শূন্য সিংহাসনে রাজত্ব করছেন তোমারই বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ কুবের। আর প্রশ্ন করো না।

॥ ৪ ॥

প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় সেই ধাতৃ-বৃক্ষের নীচে এসে দাঁড়ায় কৈকশী। অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে পথের দিকে। যদিও জানে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করে ফিরে আসবে না রাবণ, তথাপি কি একটা অব্যক্ত আকর্ষণের মায়া-মরীচিকা তাঁকে টেনে নিয়ে আসে এখানে। বক্ষ-পঞ্জরের ভিতর একটা গভীর শূন্যতা তাঁকে বিচলিত করে তোলে, তাই মোহমুগ্ধের মত সে আসে মিথ্যা দুরাশায়। ব্যর্থ তার প্রতীক্ষা। গভীর বিষণ্ণতাভার বক্ষে লয়ে পুনরায় ফিরে যায় তাপদগ্ধ সেই আশ্রমে। এমনই ভাবে কত নিদাঘ কত বসন্ত পার হয়ে যায় কৈকশীর মাতৃহৃদয়ের তপস্যায়। এমনিভাবে কেটে যায় কত দিন মাস বর্ষ!

ঋষি বিশ্রবা ভ্রূক্ষেপ করেন না এসকল। কোন দিন তাঁর রাক্ষস পুত্রদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনওনি, আজও করেন না, প্রয়োজনও বোধ করেন না। শুধু আশ্রমের প্রয়োজনীয় কাজে লোক নিয়োগ করে সে অভাব পূরণ করেছেন। বর্ণাভিমানী ঋষি, কৈকশেয়গণকে তাঁর আত্মজ হলেও মনে করেন যেন অপজাত।

কারণ ?

কারণ রাক্ষসীর গর্ভজাত সন্তান তারা। কৈকশীর অশ্রু, পাষাণ-হৃদয় ঋষির হৃদয় কোন দিন স্পর্শ করে নি। আজও করে না।

সেদিন চৈত্রসন্ধ্যার সমীরে কোন বিলাপ ছিল না। ছিল না কোন অশ্রু। আকাশের প্রান্তে প্রান্তে জমে উঠেছিল শুধু মেঘ। গর্জনভরা মেঘ। সন্ধ্যা হয়, ধরাতলের অন্ধকার নিবিড়তর হয়ে আসে। সহসা চমকে ওঠে কৈকশী, কেঁপে ওঠে তার হৃৎপিণ্ড। মেঘের গর্জন নয়, শুনতে পায় ক্রুদ্ধ ঋষির রোষ গর্জন। দ্রুত চলে আসে আশ্রমে। শুনতে পায়, তারই উদ্দেশ্যে এই রোষগর্জন—পাপিষ্ঠা রাক্ষসী। হীনগর্ভা। পাপিষ্ঠের জননী। আরও বহুতর কটু তিরস্কার।

তখনও জানতে পারে নি কৈকশী, কল্পনাও করতে পারে নি ঋষির

রোষে মিশে আছে তাঁর পুত্র রাবণেরই সফল সাধনার চকিত প্রভা। সে জানেও না যে তাঁর পুত্র ব্রহ্মার বর লাভ করেছে। রসাতল থেকে মুক্ত করেছে মাতামহ সুমালীকে। নির্বিবাদে পুনরধিকার করেছে লঙ্কার সিংহাসন। একের পর এক অবলীলায় নির্জিত করেছে শক্তিমানদের। তাই ক্রুদ্ধ ঋষির নতুন সংলাপ যেন অনল শিলার মত আঘাত করে তার হৃৎপিণ্ডে। তার পবিত্র মাতৃত্বের অমর্যাদায় বেদনামিশ্রিত রোষ-অন্তরে সে ভাবে—শেষ পর্যন্ত এত বড় সম্পর্কের প্রতিশ্রুতিও আজ বিস্মৃত হয়ে গেলেন পুণ্যবান ঋষি বিশ্রবা?

ধীরে ধীরে ঋষির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়। তাকায় ঋষির পাষাণ চক্ষুর দিকে। আজ এই মুহূর্তে তার মন থেকে সমস্ত শঙ্কা ভয় যেন অপসৃত হয়ে গেছে। আশ্রমের সমস্ত নির্মম পরিহাস যেন একটা চরমের প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে আছে। দৃঢ়কণ্ঠে ঋষিকে প্রশ্ন করে,—রাক্ষসী হলেও আমি আপনার পত্নী। আপনার সহধর্মিণী। এই সত্যটাও কি আপনি বিস্মৃত হয়ে গেছেন ঋষি বিশ্রবা? আমি পাপীষ্ঠার জননী হলেও আপনারই ঔরসজাত সন্তানের জননী, এ সত্যটাও কি আপনি জানেন না রাবণের জনক?

—হ্যাঁ জানি। তুমি জেনো, আর্য-ধর্ম আর রাক্ষস-ধর্ম এক নয়। অনার্যা কখনও আর্য ঋষির সহধর্মিণী হতে পারে না। ভোগের সামগ্রী হতে পারে মাত্র। উত্তমের সংস্পর্শে এলেই অধর্ম কখনও উত্তমত্তের দাবী করতে পারে না।

এক তপ্ত পাষাণ-স্তূপ হতে যেন অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গকণিকা কৈকশীর মুখের উপর আছড়ে পড়ল। দুই করতলে মুখ আচ্ছাদিত করে, মনে মনে তীব্র একটা দহনজ্বালা বোধ করে।

তারপর মুখাচ্ছাদন থেকে সরিয়ে নেয় হাত। মুহূর্তে যেন ধারাহতকমলের মত অশ্রুসিক্ত বিশীর্ণ হয়ে গেল কৈকশীর সেই মুখ-শোভা। কিন্তু চক্ষুতে অপমানিতের রোষ। দৃঢ় দৃষ্টিতে ঋষির দিকে তাকিয়ে বলে—ঋষিবর, আপনি শুধুই মিথ্যা আর প্রতারণার স্তূপের উপর রচনা করেছেন আপনার প্রতিষ্ঠা।

এই সামান্য কথায় অপমানিতের তীব্র জ্বালা অনুভব করেন বর্ণাভিমানী ঋষি। রোষপ্রজ্বলিত কণ্ঠে বলেন,—রসনা সংযত কর পাপীয়সী নারী। আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যাও।

চলে যেতে থাকে কৈকশী। যেতে যেতে পুনরায় শুনতে পায় ক্রুদ্ধ ঋষির রোষ-সংলাপ,—পাপীয়সীর গর্ভে জন্ম নিয়েছে এক পাপীষ্ঠ, দুরাচার, আর্য বিধি-বিধানের এক চরম শত্রু। ব্রহ্মার বর লাভ করে দুর্জয় শক্তিধর হয়ে ত্রিভুবনে একটা দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে পাপীষ্ঠ। ভগবানের বিধানকে উপেক্ষা করে সর্বজনের সমসুখের জন্য স্বর্গের সোপান রচনায় উদ্যত হয়েছে সে। সমদর্শিতার নীতি ঘোষণা করছে। গণশাসনতন্ত্রের তন্ত্র প্রচার করছে সেই পাপীষ্ঠ দুরাচার। রাক্ষসীকে গর্ভদান করে কি ভুলই আমি করেছি জীবনে। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই,—দুস্কন্ত, সুরথ, গাধি, গয় এমনকি হরিনারায়ণ পর্যন্ত কোন ক্ষত্রিয় বীরই তাকে পরাস্ত করতে পারল না! শাস্তি দিতে পারল না! সমস্ত বীরই তার কাছে নতশির হল! বিজয় গর্বে আসুক সে আশ্রমে, আমি তাকে পদাঘাতে বিতাড়িত করব। দুরাত্মা ললাটের লিখন বুঝতে অক্ষম।

এক অপার আনন্দ শিহরণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কৈকশীর অন্তর। এক অতি প্রত্যাশিত অপার হর্ষ যেন তাকে উন্মাদ করে তুলতে চাইল। এ যেন তিরস্কার নয়, নব বসন্তের কোকিল কণ্ঠ। এ তিরস্কার যেন সহসা এনে দেয় তার মরুবক্ষে পিযূষ বন্যা। চলার গতি তার মন্থর হয়। মধুসন্দেশি তিরস্কার যেন আরও শুনতে চায় সে। যে পৃথিবীটার সমস্ত সৌন্দর্য তার অন্তর থেকে মুছে গিয়েছিল, আজ ঋষি বিশ্রবার বজ্রভাষ যেন তার সেই শুষ্ক অন্তরে নিয়ে এল বসন্তের বার্তা। মুকুলিত হয়ে উঠল তার আশা। যাতনাময় বক্ষে হাস্যময় হয়ে উঠল হর্ষ। জীবনের যে সত্য আশাভঙ্গের বেদনায় নিজেরই যৌবনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল তা যেন আজ ফুল্লরিত হয়ে উঠল। আপন বক্ষের গর্ব যেন মুখর হয়ে বলছে,—জীবন তোমার মিথ্যা হয় নি কৈকশী। যৌবন মিথ্যা হয় নি। ভুল হয় নি তোমার।

অত্যাচারীর হিংস্র ভুজঙ্গের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করবে তোমার পুত্র।

কৈকশী তার অন্ধকার অন্তরে আজ দীপান্বিতার উৎসব অনুভব করে। কিন্তু শুনতে পায়, তার উৎসব প্রদীপ ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চাইছে দেববর্ণিনী,—যে পাপীয়সী আমার পুত্রের দুর্ভাগ্যের কারণ তাকে দূর করে দাও আশ্রম থেকে। এ আশ্রমে আর তার স্থান নেই। চলে যাক সে তার ঐ পাপীষ্ঠ পুত্রের আশ্রয়ে!

অতীত জীবনের মলিন ও তপ্ত খণ্ড খণ্ড অধ্যায়গুলির দিকে ফিরে তাকায় কৈকশী। কিন্তু, আজিকার এই আনন্দ আলোকে সে সবই যেন বিলীন হয়ে যেতে থাকে। সেই আলোকে শুধু ভেসে ওঠে রাবণ। দিগ্বিজয়ী পুত্রকে স্নেহ-চুম্বনে বরণ করে নিতে মনে মনে প্রস্তুত হয় সে।

॥ ৫ ॥

লঙ্কা। রত্নাভিমানী লঙ্কা যেন কোন অভিমানে মর্তভূমির আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দূরে নীল সাগরের মাঝে। ত্রিকূট শিরশীর্ষে পুষ্পবেণীবন্ধের মত সাজিয়ে রেখেছে রত্নময় প্রাসাদ। অভিমানিনীর অনুরাগের লজ্জা যেন ঢেকে রেখেছে হরিদ্‌বর্ণ তৃণাচ্ছন্ন ভূমি, পুষ্পিত বনরাজি আর সরলকর্ণিকার কুটজ কদম্ব মেখলায়। লজ্জাহীন অশান্ত সাগরবায়ু বার বার মেখলা আন্দোলিত করে দিয়ে প্রগল্‌ভের মত হেসে হেসে চলে যায়।

অনেক আকাঙ্ক্ষায় ও স্পৃহায় রচিত এই মায়াপুরী যেন রমণীয় দেবপুরীর ঈর্ষা। পদ্ম-উৎপল শোভার মাঝে আনন্দে কেলি করে হংস-কারণ্ডব। কুসুমিত কিংশুকের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকে বনমৃগী। কোন নৃত্যপরার বিরামবিহীন নূপুরিত পদসঞ্চারের মত বিরামবিহীন কিংকিণীধ্বনি রবে আনন্দে নৃত্য করে পুরীশীর্ষের বিজয় কেতন।

মিথ্যা আশ্বাসে ও বিশ্বাসে যেন মুগ্ধ হয়ে বহু ম্লান বসন্ত কাটিয়েছে লঙ্কা। লুণ্ঠক রাজা কুবেরের ধর্ষণে, সৌরকরতাপিত কমলের মত বিশীর্ণ, ম্লান হলেও লঙ্কা নিঃশেষ হয়ে যায় নি। লুণ্ঠক রাজা কুবের লঙ্কাকে অধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে রাক্ষসের সমস্ত জাতিসত্তাটাকে দুর্বল করে তাঁর জীবন-বোধটাকেই বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল। অভিশপ্ত এই লঙ্কায় আজ সঞ্চারিত হয়েছে নবজীবনের স্পন্দন, দেখা দিয়েছে নব বসন্তের হিল্লোল। দুর্ভাগা দেশের ললাটে, তাপদগ্ধ ধরণীতে বর্ষাগমের মত দেখা দিয়েছে রাবণ। জাতির কাছে কোন মুক্তিপণ তার দাবী নয়। দাবী শুধু হৃদয়, দাবী শুধু সমদর্শিতা। দাবী শুধু পরস্পরের প্রতি সহৃদয় অনুকম্পা। দাবী শুধু সর্বজনহিতে নিষ্ঠা।—এ শুধু কথার কথা নয়, এ লঙ্কাধিপতি রাবণের জীবনের ব্রত। এক নতুন জীবনের পরিচয়বাণী রাষ্ট্রপ্রধানের মুখ হতে যেন মন্ত্রধ্বনির মত উৎসারিত হয়। শুনতে শুনতে প্রসন্ন হয়ে ওঠে প্রজাপুঞ্জ। একটা নব জীবনের

বন্যাস্রোতে উদ্বেল হয়ে ওঠে জাতি। লঙ্কার শীর্ণ বক্ষ হতে সরে যায় দুঃখের গোপন বিলাপ।

লঙ্কার প্রজাপুঞ্জকে লক্ষ্য করে সুমালী বলেন,—এ কোন অনাচার-কলুষ-ক্লিন্ন অভিসন্ধির চাটুভাষিত স্তুতি নয়। এ রাবণের মহৎ প্রতিজ্ঞা। এক লোকহিতব্রতীর সর্বজনে সমস্বর্গসুখবিধানের অঙ্গীকার।

প্রাবৃষার অম্বুদনাদে চাতকী যেমন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে তেমনই হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে লঙ্কা।

এক গভীর প্রশান্তির ছায়া নেমে আসে কৈকশীর বদন-মণ্ডলে। তার প্রিয় পদ্মবনে বৈদূর্যসোপানে বসে ভাবে,—স্বপ্নও তবে সত্য হয়! তবে হ্যাঁ, দুঃসহ এক বন্দীজীবন থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। দীর্ঘদিন নিদাঘতাপিত মরুজীবন থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। দাম্পত্যজীবনে শুধু শৃঙ্গার রস ভিন্ন আর কোন রসই যেখানে ছিল না, সেই নিষ্ঠুর জীবন থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। এ সবই সত্য। কিন্তু কি আশ্চর্য, কি একটা অব্যক্ত মোহের আকর্ষণ থেকে সে আজও নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না। ঋষি বিশ্রবা যেন আজ করুণার পাত্র। ভুলতে পারে না তাঁকে। দুঃসহ সেই জীবনটা আজ যেন একটা গভীর আবেশে জড়িত হয়ে মোহময় স্মৃতি হয়ে উঠছে তার চিন্তায়। বুঝতে পারছে, মণিদীপিত কক্ষে রত্ন-পর্যঙ্ক আর জীর্ণ কুটিরে কুশ-তৃণ-শয্যা এক নয়, এক নয় সুরভিত কুঞ্জকানন আর পর্ণতরুর ছায়া, তথাপি একটা মায়া অনুভব করে। অন্তরের এই বিচিত্রগতি বুঝতে পারে না কৈকশী। মায়াসিক্ত অন্তরে রাবণকে বলে,—বৎস, ঋষি বিশ্রবা নিষ্ঠুর হলেও তোমার পিতা, দেববর্ণিনী বিমাতা হলেও শ্রদ্ধেয়া, কুবের তোমার বিমাতাপুত্র হলেও জ্যেষ্ঠ। তোমার রোষানল তাঁদের যেন তাপিত না করে।

রাবণের চক্ষুতে ফুটে ওঠে বিস্ময়ের কৌতূহল। বুঝতে পারে না রাবণ মাতার এই বিচিত্র অনুকম্পার কারণ কি। বিশ্বনারীর নিভৃত জীবনের নেপথ্যে হৃদয় থেকে কোন্ কথা উৎসারিত হয় সে কথা জানে না রাবণ। তাই প্রশ্নাকুল দৃষ্টিতে তাকায় মা'র মুখের পানে।

—বৎস, এ আমার আবেদন। এ আমার অনুরোধ। কারণ জিজ্ঞাসা করো না।

একটা অবিশ্বাসের শিলায় আহত হয় রাবণের অন্তর। শান্তস্বরে বলে,—মা, আমি জানি ঋষি বিশ্রবা আমার পিতা, আর দেববর্ণিনী বিমাতা হলেও মাতৃতুল্য শ্রদ্ধেয়া। তুমি নিশ্চিন্ত হও মা, একমাত্র গর্বোদ্ধত কুবের আমার লক্ষ্যপথে বাধা না হলে আমি তাঁকেও আহত করব না।—চলে যান কৈকশী।

মাতার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রাবণ ভাবে,—কি অদ্ভুত ক্ষমার আদর্শে গঠিত এই নারী হৃদয়। মমতাময়ী জননী আমার, তুমি জান না কুবের তোমার পুত্রের বিনাশের জন্য কি গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। জানি না, কোন্ মহাশিল্পী বিস্মৃতি দিয়ে রচনা করেছেন নারী হৃদয়। জননী. তোমার অশ্রু বিমোচনে হয়তো তুমি বিস্মৃত হয়েছ সব। আমি কিন্তু ভুলতে পারি নি নির্যাতিত নিষাদদের অশ্রু আর আর্ত বিলাপ, যা এখনও আমি মোচন করতে পারি নি। যে চিন্তা আমাকে তুষানলের মত দগ্ধ করছে।

—প্রভু।

চমকে ওঠে রাবণ। রাণী মন্দোদরীর কণ্ঠ! —প্রভু, বীরের বদনে হাসি কি অজ্ঞাত, অথবা দুর্লভ ?

—বীর হাসে অন্তরে, আর নারী হাসে বদনে।

—তার অর্থ নারীহৃদয়ে প্রতারণা থাকে লুক্কায়িত। —অভিমান-কুণ্ঠার ছায়াপাত ঘটে মন্দোদরীর কণ্ঠে।

ওষ্ঠ সন্ধিতে ঈষৎ রহস্যহাস্য স্ফুরিত করে রাবণ বলে,—লাবণ্যময়ী দানবনন্দিনী, তোমার ঐ রূপটি দেখবার জন্যই আমার আঘাত। বল প্রিয়ে, কি তোমার মধুভাষণ।

—শুধু যুদ্ধই যদি হয় পুরুষের ধর্ম, তবে প্রতারণাময় হাস্য নারীর ধর্ম হতে দোষ কি ?

—উত্তম প্রত্যাঘাত করেছ রাণী। পুরুষের ধর্ম যদি নারী নির্ণয়

করত তবে হয়তো ভিন্নরূপ হত, কিন্তু দুঃখের বিষয় উভয়েরই নিতান্ত প্রকৃতিগত। পুরুষ উল্কা আর নারী তার পুচ্ছ।

—উত্তম, আমি মনে করি আমার উল্কার বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। বহু যুদ্ধ জয় করে বহু বীরকে নির্জিত করে সে বীরশ্রেষ্ঠ হয়েছে, আর তার যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। এখন সে পুচ্ছ নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্য পরিচালনা করুক। পুচ্ছ সহ বিশ্রাম গ্রহণ করুক।

উচ্চরবে হেসে উঠলেন রাবণ। হাস্য সংবরণ করতে করতে বললেন,—নারী, তুমি তোমার যোগ্য কথাই বলেছ। কিন্তু, দুঃখের বিষয় আমার গতিসীমানা তোমার ইচ্ছানির্ভর নয়।

—কিন্তু‥ ‥।

—আর 'কিন্তু' নয় ময়নন্দিনী মন্দোদরী, আমি জীবনে কোন দিন তোমার ন্যায় পুষ্পশয্যায় নিদ্রা যাই নি। আমার জীবনে যৌবন এসেছে বসন্ত বায়ু নিয়ে নয়, এসেছে বৈশাখী ঝঞ্ঝার গতিবেগ নিয়ে। আমার অন্তরে সুপ্ত জ্বালা শোষণ করে নিয়েছে আমার অশ্রুকূপ।

—সেই কারণেই আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন, সুখভোগের প্রয়োজন।

—মৃগনয়নে, তোমরা গতানুগতিক সুখভোগের চিন্তার আবর্তে মগ্ন থাক। সে বিচারে তোমরাও নিতান্তই আত্মস্বার্থপরায়ণা, আত্মভোগপরায়ণা। লোকহিতের আদর্শ তোমাদের অজ্ঞাত। অথবা, স্বার্থহানীর ভয়ে পরিহার করে চল।

—জানতে ইচ্ছা করে আমার কি কর্তব্য। আমার কাছে আপনার কি আশা?

—তুমি আমার সহধর্মিণী হও, সহমর্মিনী হও। আমার আদর্শই হোক তোমার আদর্শ। আমার লক্ষ্যই হোক তোমার লক্ষ্য।

—আপনার আদর্শই বা কি, আর লক্ষ্যই বা কি?

—আমার আদর্শ, সর্বজনে সমদর্শিতা। লক্ষ্য, সর্বজনে সমসুখ বিধানের পথ রচনা!

—মার্জনা করবেন প্রভু, স্পষ্ট কিছু বুঝলাম না। পাপী আর পুণ্যবান কি আপনার বিচারে সমান দৃষ্টি পাবে? পার্থিব সুখের আকর পার্থিব সম্পদ কি সর্বজন সমভাবে ভোগ করতে সক্ষম?

—সুবদনে! ভোগ সুখের ক্ষমতা ব্যক্তিশক্তিতে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সুযোগ সীমিত হওয়া উচিৎ নয়, সম হওয়াই উচিৎ। অন্যথায় প্রতারণা ও বঞ্চনার সুযোগ থাকে। আর সেই সুযোগ গ্রহণ করেই পরস্বাপহারিগণ আত্মস্বার্থে রচনা করে বিধি-বিধান। আর সম-দৃষ্টির অর্থ মানুষকে মানুষের যথামর্যাদা দিয়ে দেখা। প্রিয়দর্শিনী, তুমি রাজনীতিতে অনভিজ্ঞা হলেও বিদূষিণী, নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমতী। তোমার উন্নত উরজের অন্তরালে অবশ্যই একটা মানব হৃদয় বলে হৃদয় আছে।—(লজ্জিতা হয়ে নারীর স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসে বক্ষাবরণ টেনে দেয় মন্দোদরী)—সে হৃদয়কে যদি প্রসারিত কর তবে অনুভব করতে পারবে—মর্তভূমের আকাশ-বাতাস ভরে আছে অত্যাচারিতের ক্রন্দন রোলে।

—এটাই তো স্বাভাবিক। এটাই তো জাগতিক নিয়ম। বিধির বিধান কে খণ্ডন করতে পারে।

—না, এটা স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক। জাগতিক নিয়মও এটা নয়। চলমান জগতে সকলই পরিবর্তনশীল। না হলে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ একই ভাবে চলত। স্বার্থান্ধ প্রতারকগণ তাদের সুখের অবস্থাটাকেই স্থিতিশীল ও চিরন্তন বলে প্রচার করে। এটা বিধির বিধান নয়, আমাদের বিধান,—স্বার্থান্ধদের বিধান। শাস্ত্র, সংহিতা, শাসন, অনুশাসন আর সংস্কারের নিগূঢ় বন্ধনে আমরাই আবদ্ধ করে রেখেছি মানবতাকে। সেই আর্ত মানবতার ক্রন্দনে আমি অস্থির হয়ে উঠি মন্দোদরী।

—অন্য কেহ কি আর সে ক্রন্দন শুনতে পায় না?

—যাঁদের হৃদয় আছে তাঁরাই শুনতে পান। যাঁদের হৃদয় স্বার্থ

সাগরে নিমজ্জিত হয়ে গেছে তাঁরা শুনতে পান না। তাঁদের কাছে হৃদয় থেকেও স্বার্থ বড়, স্বার্থই তাঁদের কাছে প্রধান।

—এও এক প্রকার আত্মসম্মোহন।

—এ সম্পূর্ণ এক মিথ্যা অভিযোগ। আশাবঞ্চিতা নারীর অভিমান-ক্ষোভের ভাষা। চিরসুখে লালিতা নারীর অজ্ঞ তামসিকতার সংলাপ মাত্র। দিকে দিকে ঘৃণা, অবজ্ঞা, অবিচার, উৎপীড়ণ এও কি তুমি দেখতে পাও না সুখপালিতা সুন্দরী? তুমি কি দেখতে পাও না, সংস্কারে গড়া দুর্লঙ্ঘ্য এক প্রাচীরের অন্তরালে প্রতারণার পঙ্কিল আবর্ত? দেখতে পাও না কি বর্ণে-বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, সম্পন্ন আর নিঃস্বের মাঝে রচিত হয়েছে ভেদাভেদের এক সুগভীর পরিখা? আমি এই অন্যায়ের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেঙ্গে দিতে চাই। আর স্তূপ দ্রব্যে রচনা করতে চাই স্বর্গের সোপান।

—এ এক অসম্ভবের পশ্চাতে ধাবিত হচ্ছেন আপনি। আপনার স্বর্গের সোপানরচনা কল্পনার মঞ্জুষাতে আবদ্ধ থাকবে প্রভু।

—কারণ?—উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাবণের কণ্ঠস্বর।

—ত্রিভুবনে ছড়িয়ে আছে অগণিত রাজা আর মাণ্ডলিক, তাঁদের বিরুদ্ধে আপনি একা কি করতে পারেন?

বিহসিত বদনে রাবণ বলেন,—সরলা, তুমি কি জান না, রাজা একা যুদ্ধ করে না? রাজার শক্তির উৎস প্রজাপুঞ্জ। অথচ এই প্রজাপুঞ্জই থাকে অবহেলিত। এই প্রজাপুঞ্জই হবে আমার সহায়। অভিনব হলেও আমি গণ-প্রজাতন্ত্রের নীতির কথা বলছি। আমি যুদ্ধ করব, জয় করব, ন্যায় ও মানবতার ধর্ম প্রতিষ্ঠা করব।

—প্রভু, ন্যায় ও সত্যধর্মের বিচারক ধর্মরাজ। তিনিই পাপ পুণ্য, ধর্মাধর্ম বিচার করে স্বর্গ নরক বাসের বিধান দেন। তিনি সকল রাজশক্তির সাহায্যপুষ্ট অশেষ শক্তিমান। তাঁর শক্তিতে হস্তক্ষেপ করে এমন শক্তিমান ত্রিভুবনে কেহ নেই। ধর্মরাজের বিধান আমোঘ বলে ত্রিভুবনে স্বীকৃত।

সেই পুরাতন সংস্কারের প্রতিধ্বনিই যেন শুনতে পান রাবণ।

এক সুকঠিন দৃষ্টি তুলে তাকান মন্দোদরীর দিকে। সে দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে প্রতিজ্ঞা প্রত্যয়ের চিহ্ন। ভাষা হয়ে ওঠে তপ্ত। শ্লেষ বিহসিতে বলেন,—যথার্থই বলেছ পতিপ্রাণা দানবনন্দিনী মন্দোদরী। এতক্ষণ আমি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা করছিলাম। জেনে যাও সুন্দরী, তোমার পতি রাবণ নীতিভ্রষ্ট কদাচারী নয়, দুর্বলও নয়। ত্রিভুবনের বীর রাজন্যকুল আমার ভয়ের কারণ নয়, আমিই তাঁদের আতঙ্ক। আমার নীতি তাঁরা আতঙ্ক-ঘণ্টাধ্বনির মত শোনেন। শোনেন মৃত্যু-ঘণ্টাধ্বনির মত। আরও জেনে যাও,—ধর্মরাজ্য জয় করে, প্রতারণার নরক থেকে সমস্ত পাপীদের মুক্তি দিয়ে আমি আমার নীতিপথের উদ্বোধন করব। লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার প্রতি করুণাপরবশ আছেন।

শক্তি নেই মন্দোদরীর। এই দুর্ধর্ষ পুরুষকে তাঁর এই কঠিন কঠোর পথ থেকে বিরত করতে পারে সে সাধ্য নেই তাঁর। এই ভয়ানক নীতির আক্রমণ থেকে কেমন করে এই সুন্দর পুরুষকে রক্ষা করা যায়। এই প্রশ্নই আজ তাঁকে এক দুরন্ত ভাবনার অন্ধকারে নিয়ে চলে যায়। যুদ্ধ আর যুদ্ধ, জয় আর জয়, নীতি আর নীতি, এও যেন এক ভয়ানক মদিরামত্ততা। ভীতিক্রান্ত সজল নয়নে সে বলে,—আমার দুর্বলতাকে ক্ষমা করুন প্রভু। আমি অসাধারণের পত্নী বলে গর্বিতা।

—তুমি এক অসাধারণ পুত্রেরও জননী। যাও রমণী, কক্ষান্তরে যাও। তোমাদের লোকপূজিত ধর্মরাজের সাক্ষাৎ-লগ্নের প্রতীক্ষায় আমি কালচক্রের আবর্তন গণনা করব।

এক ছায়ামূর্তির মত বিষণ্ণ প্রতিমা মন্দোদরী কক্ষান্তরে চলে যায়।

॥ ৬ ॥

দূর থেকে দেখা যায় সেই মহিমময় ধর্মনগরী, ধর্মরাজের রাজধানী। নীলাকাশে অভ্রমালার মত স্তবকে সজ্জিত শঙ্খধবল ভবনশ্রেণী যেন আর এক অলকাপুরী। অতি গভীর পরিখা আর শিলা প্রাকারে বেষ্টিত। অতি সুরক্ষিত। একটা গম্ভীর নৈঃশব্দ যেন গভীর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ধর্মরাজ্যের সারা দেহে। পার্থিব পরিখা আর প্রাকারকে বেষ্টন করে ধর্মরাজ্যকে রক্ষা করে চলেছে ন্যায়-নীতি আর ধর্মের অদৃশ্য আর এক প্রাকার। দুর্ভেদ্য সেই প্রাকার। ত্রিভুবন জানে ন্যায়ধর্মের রক্ষক ধর্মরাজ যম বিন্দু পরিমাণ অন্যায় অধর্ম সহ্য করেন না। নীতিনিষ্ঠাই তাঁর জীবনের একমাত্র ধর্ম। ত্রিভুবনের সকলের সহায়তায় অতি নিষ্ঠা সহকারে তিনি ন্যায়ধর্মকে রক্ষা করে চলেছেন। অমোঘ তাঁর বিধান। ত্রিভুবনে এমন ন্যায়বান পুরুষ কেহ নেই যে ধর্মরাজের ন্যায়বিচারে প্রশ্ন করতে পারেন। কোন প্রশ্ন, কোন আর্তনাদ, হৃদয়ের কোন আবেগ তাঁকে বিচলিত করতে পারে না, ন্যায়ধর্মের বিচার থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। ত্রিভুবন বিশ্বাস করে পাত্র ও অপাত্র বিবেচনা নেই, সকলেরই প্রতি সমান বিচার করে থাকেন সমদর্শী ধর্মরাজ। বিচারাসনে কোন দুর্বলতা তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করে না। ধর্মরাজ জানেন এবং বিশ্বাসও করেন, ত্রিভুবনের সমস্ত নিয়ম-নীতি শান্তি ও শৃঙ্খলা যেন অদ্রিশীর্ষে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁরই ন্যায় বিচারের স্তম্ভে।

কালচক্রের নিয়মের আবর্তে একটি দিন বা একটি রাত্রিতেই যেমন বিভাবসু আর নিশাকরের কর্তব্য সমাধা হয়ে যায় না, সংসার আবর্তে নিত্যনিয়মিত তাঁদের আবির্ভাব ঘটে, তেমনই নিত্য নিয়মিত ধর্মরাজ ধর্মাধিকরণে আসেন, মণিময় স্বর্ণসিংহাসনে বসেন, দুর্বোধ্য এক চিন্তাকুটিল দৃষ্টিতে বিচারকক্ষে তাকান। একে একে

উঠে দাঁড়ান শাস্তিরক্ষক জলদগ্নিতুল্য কালদণ্ড, নরকাধিপতি প্রাশ মুদ্‌গরধারী ত্রিলোক সংহারক মৃত্যু।

বিচারের লিপি নিবন্ধ ভূর্জপত্র হস্তে উঠে দাঁড়ান চিত্রগুপ্ত। ধর্মরাজ শুরু করেন পাপীনির্ধারণে ধর্মবিচার আর দিতে থাকেন তাঁর ন্যায় শাস্তির বিধান। তাঁর দুই পাষাণ চক্ষুতে ফুটে ওঠে ক্রূঢ় কুটিল দৃষ্টি। আহ্বান করেন বিধিলিপি। একটা অস্ফুট শঙ্কা যেন ভেসে বেড়াতে থাকে ধর্মাধিকরণকক্ষে। চিত্রগুপ্ত ক্রম অভিযোগ-লিপি পাঠ করে বলতে থাকেন—ভগবন, ধর্মরাজ! পাপিষ্ঠ এই দুরাচার নিষাদ বলপূর্বক তাঁর মাণ্ডলিক পত্নীর শ্লীলতাহরণ করতে উদ্যত হয়েছিল। অভিযোগ গুরুতর। মাণ্ডলিক বিচারপ্রার্থী।—কক্ষবায়ু তপ্ত করে অসহায় আর্তকণ্ঠে নিষাদ চীৎকার করে বলে ওঠে,—মিথ্যা, মিথ্যা। সম্পূর্ণ এক বিপরীত অভিযোগ। সম্পূর্ণ মিথ্যা ভগবন, ধর্মাবতার। আমাকে ব্যবহার করে মাণ্ডলিক পত্নী তাঁর কাম ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে মিথ্যা এই অভিযোগ এনেছেন।

ভীমরবে গর্জে ওঠেন ধর্মরাজ। কেঁপে ওঠে কক্ষের হৃৎপিণ্ড। স্তব্ধ হও। রসনা সংযত কর হীনযোনিজ পাপিষ্ঠ। মাণ্ডলিক কখনও মিথ্যা বলে না। মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে ধর্মরাজ বলেন,—পাপিষ্ঠ হবে সারমেয়ভক্ষ। নরকে এই পাপীর অর্ধপ্রোথিত দেহ ক্ষুধায় ক্ষিপ্ত সারমেয়গণ ভক্ষণ করবে। পরজন্মে এই পাপী সারমেয় যোনিতে জন্মগ্রহণ করবে।

ভয়াবহ শাস্তি। আর্তরবে কেঁদে ওঠে পাপী। বিষণ্ণ হয়ে ওঠে কক্ষবায়ু। অদৃষ্ট ভগবানের উদ্দেশ্যে সে বলে—হে, অদৃষ্টের ঈশ্বর, তুমি সত্যের সাক্ষী হয়ে থেকো।

পুনরায় উঠে দাঁড়ান চিত্রগুপ্ত,—ভগবন ধর্মরাজ! এই নরাধম চণ্ডাল, ব্রাহ্মণে নির্দিষ্ট জলাশয় স্পর্শ করে অপবিত্র করেছে। ব্রাহ্মণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে।

এক 'সর্বনাশ' ধ্বনিত হয় কক্ষে। বিষণ্ণ পাপীর কণ্ঠ থেকে

নিঃসৃত হয় অস্ফুট সংলাপ,—ভগবন, অতি পিপাসায় জীবনরক্ষায় আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম ন্যায়-অন্যায়, অধিকার আর অনধিকার।

—পাপীর কোন কথা বলার অধিকার নেই। এই পাপী নরকের তপ্ত ক্ষারস্রোতে নিক্ষিপ্ত হবে। তীব্র পিপাসায় ক্ষার নদীতে হবে এই পাপীর জীবনাবসান। পরজন্মে হবে সে চাতক যোনিজ।—বিধান দিলেন ধর্মরাজ। বাষ্পায়িত হয় চণ্ডালের চক্ষু। আর্তনাদের ঝড় ওঠে তার বক্ষে।

চিত্রগুপ্ত—ভগবন, ধর্মাবতার, তৃতীয় পাপী এক চিকিৎসক। এক মহামাণ্ডলিক পুত্রের রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ হয়ে তাঁর জীবনহানির কারণ হয়েছে। মহামাণ্ডলিক বিচারপ্রার্থী।

ধর্মরাজ—চিকিৎসায় ব্যর্থতার অর্থ, ভগবান অথর্বার অবমাননা। বেদদ্রোহিতার অপরাধ। এই পাপী স্বামী-স্ত্রী নিজ হস্তে আপন পুত্রের শির দ্বিখণ্ডিত করে পিতা-মাতার পুত্রশোকের যন্ত্রণা অনুভব করুক। তাদের এই দুরূহ কার্য সম্পন্ন করতে হবে অকম্পিত হস্তে, বিনা অশ্রুপাতে। এই আমার অলঙ্ঘনীয় বিধান।

অকস্মাৎ যেন একটা দারুণ তপ্ত শিলাঘাতে আহত হয়ে সংজ্ঞা হারায় চিকিৎসক দম্পতি। অচেতনে চিকিৎসক পত্নী বলে,—হে ঈশ্বর আমার, চেতনা চিরতরে লুপ্ত করে দাও। এ অসহ্য শাস্তির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও।

চিত্রগুপ্ত—ভগবন, ধর্মরাজ, চতুর্থ পাপী এক রাজদ্রোহী যুবক।

শুনে আতঙ্কে চমকে ওঠেন ধর্মরাজ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান পাপীর দিকে। দেখতে পান, ঐ যুবকের দুই চক্ষুতে জ্বলছে একটা অসাধারণ সাহসের দীপ্তি। —ভগবন্, এই পাপী নিজেই শুধু রাজকর দানে বিরত থাকে নি। অভাব দুর্ভিক্ষের কথা বলে অপরাপর প্রজাগণকে রাজার প্রাপ্য করদানে বিরত থাকতে উৎসাহিত করেছে। সহসা ক্রোধান্ধের মত চিৎকার করে বলে ওঠেন ধর্মরাজ,—পাপীষ্ঠের মাত্রাহীন স্পর্ধা। মেঘের বক্ষ হতে বিদ্যুৎ আকর্ষণের দুঃসাহস! নক্রসমাকুল সাগরে সন্তরণ! স্পর্ধা কত গগনচুম্বী হলে, সাহস

কত দুরন্ত হলে সামান্য একটা যুবক রাজদ্রোহী হতে পারে। এই পাপীকে কোন্ শাস্তি দিলে আমি শান্ত হতে পারব তা নির্ণয় করে উঠতে পারছি না। —অসিপত্রবনে আমৃত্যু পদশ্চারণা ? অথবা তপ্ত তৈল কটাহে নিক্ষেপ ? বেত্রাহত স্থানে লবণাক্ত জল সিঞ্চন ?

মৃত্যুর শাণিত চক্ষু এই মুহূর্তেই যেন ছিন্ন-ভিন্ন করে নিতে চায় বিদ্রোহী যুবকের দেহ। মৃত্যুর কিঙ্কর পিশাচ, প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় শাণিত অসি হস্তে প্রস্তুত হয়। সকলই দেখে যুবক, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে না। বিস্মিত হন ধর্মরাজ। ভাবেন,—একি কোন শিলামূর্তি, অথবা কোন যন্ত্রণাবোধশূন্য মৃত্যুভয়হীন উন্মাদ !

—ভগবন্, ধর্মরাজ ধর্মাবতার !—যুবকের কণ্ঠে কোন ভয়ের কম্পন নেই। চক্ষুতে নেই কোন ত্রাস। সুধীরে বলতে থাকে,—মৃত্যুর ভয়ে আমার হৃদয় ভীত নয়। সত্যভাষণে যেদিন আমি রাজদ্রোহী বলে চিহ্নিত হয়েছি সেদিনই আমি মনে মনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিয়েছি। আমার জিজ্ঞাসা—তবে কি প্রয়োজন ছিল ধর্মরাজের ফণিনীর উদারতা বিচারের প্রহসনে ? আমি অদৃশ্য ঈশ্বরের উচ্চতম বিচারালয়ে প্রণতি জানিয়ে বলছি, কবে স্তব্ধ হবে ধর্মরাজ, আপনাদের কপট ন্যায়ধর্মের আবরণে অত্যাচারের উৎসব। মানুষের অন্তরাত্মাকে যন্ত্রণাক্ত করে মর্ত্যভূমে আর কতদিন চলবে আপনাদের মানবতাবাদের কপট অভিসার। কবে আপনাদের অত্যাচারের হিংস্রভুজ-ভুজঙ্গম থেকে রক্ষা পাবে সত্যধর্ম ?

বিদ্রোহী যুবকের সত্যভাষণের অবিচলিত স্পর্ধায় তপ্ত হয়ে ওঠে ধর্মরাজের স্নায়ুতন্তু। দুই চক্ষুতে স্ফুরিত হয় রোষাগ্নি শিখা।—উদ্ধত দুর্বিনীত যুবক এই মুহূর্তেই তোমার মৃত্যু হয়তো আমার কাম্য, কিন্তু ধীরে ধীরে মৃত্যু-যন্ত্রণায় নরক ভোগে তোমার মৃত্যু হোক, এই বিধানই আমি ইচ্ছা করি। অন্যথায় এই মুহূর্তেই তোমার শির স্কন্ধচ্যুত হত। আমার বিধান ন্যায়নিষ্ঠ অলঙ্ঘনীয়।

—ভগবন্, কোন মৃত্যুই আমার নিকট ভয়াবহ নয়। ভগবন্, আমার ভয়, ত্রিভুবন হয়তো কোন দিনই আপনাদের সমাজের দুঃসহ

প্রতারণাময় শাসণ বৃত্তান্ত জানতে পারবে না। মহাকালের পাষাণ হৃদয় থেকেও এ কাহিনী নিশ্চিহ্ন করে দিতে প্রয়াসের অন্ত থাকবে না। কিন্তু জানবেন সত্য কালজয়ী।

—বিদ্রোহী যুবক, কোন্ পাপীষ্ঠ তোমার মুখে তুলে দিল ঐ বজ্রজ্বালাময় ভাষণ ?

—ধর্মের রক্ষক ধর্মরাজ, এ কোন অনুকরণের ভাষা নয়, এ শুধু আমার ভাষাও নয়, এ বেদনাবিড়ম্বিত সকল বিদ্রোহী হৃদয়ের স্বতস্ফূর্ত ভাষা। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, চলবেও হয়তো। কিন্তু প্রতিকার একদিন হবেই।

হঠাৎ আপন অন্তর্লোক থেকে একটা অভিশাপের বাণী শুনে চমকে ওঠেন ধর্মরাজ। নিজেরই অজ্ঞাতে স্বগত অস্ফুটে বলে ওঠেন,—না, না, মিথ্যা। এ কোন অভিশাপের বাণী নয়। এ শুধু মিথ্যা ভ্রম। আমার মনের দুর্বলতা মাত্র।

পরিচারক এসে জানায়, ভগবন্ ধর্মরাজ, সোমরস গ্রহণের সময় উত্তীর্ণপ্রায়।

ইঙ্গিত হাস্যে মৃত্যু আর কালদণ্ডের দিকে তাকিয়ে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান ধর্মরাজ।

* * *

ক্ষার নদী। কেউ জানে না কবে এবং কোথা থেকে ক্ষার নদী তার যাত্রা করেছিল শুরু, আর কোথায় গিয়ে তার যাত্রা করেছে শেষ। ত্রিভুবনের সকল পরিত্যক্ত মূত্র-পূরিষ, বিষাক্ত আবর্জনা আর যত-যত পশু-পক্ষীর গলিত মৃতদেহ আপন বক্ষে বহন করে নিয়ে চলেছে কর্দমময় পচন-বিষাক্ত ধীরবহ এই ক্ষারধারা। ত্রিভুবনের সমস্ত অভিশাপ যেন আপন হৃদয়ে ধারণ করে সে বয়ে চলেছে নীরবে। আপন বক্ষের তীব্র জ্বালা আর পুতিগন্ধ, ক্ষোভে-দুঃখে ছড়িয়ে দিয়ে চলেছে আকাশে বাতাসে।

ক্ষারধারার পার্শ্বলগ্ন দুই কুলে তীক্ষ্ণ কণ্টকগুল্মময় নিবিড় অসি-পত্রবন। ক্ষার নদী আর অসিপত্রবন, যেন দুই অভিশপ্তা সহোদরা। যেন ত্রিভুবনের দুইটি মূক-কান্না। বহু আর্ত-কান্না আর মৃত্যুযন্ত্রণার মূক সাক্ষী।

ধর্মরাজ মনে করেন, পাপীদের পাপস্খালন আর মুক্তির যোগ্যস্থান এটাই। ত্রিভুবনের কেউ কোনদিন জানতে পারবে না কিছু। শুধু সাক্ষী থাকবে দুই মূক-বধির সহোদরা। তাই তিনি তাদের কবরী গ্রথিত করেছেন 'নরক' সজ্ঞায়। পিশাচের পাপী ধর্ষণের কোন আর্তক্রন্দন শোনা যাবে না। মুক্তিভিক্ষার আর্তক্রন্দনে বিচলিত হবে না ত্রিভুবনের হৃদয়। সব মিশে যাবে ক্ষার নদীর পূতিগন্ধে। খাদ্যলাভে হিংস্রশ্বাপদের উল্লাস-নৃত্যে বনের হৃদয় রোমাঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু নরকে মৃত্যুর কিঙ্কর হিংস্র পিশাচের উল্লাস নৃত্যে ত্রিভুবনের মানব হৃদয় রোমাঞ্চিত হবে না। কেউ তা শুনতেও পাবে না। পাপীর বিলাপ শোনাও পাপ। তাই, ধর্মরাজের কঠোর নির্দেশে কারা-নরকের প্রধান-মৃত্যু নিশ্ছিদ্র করেছেন নরকের আরক্ষ ব্যবস্থা। সুউচ্চ শিলাপ্রাকার আর লৌহ-কণ্টকে বেষ্টন করে রেখেছেন নরকের দেহ।

ধর্মরাজ সহৃদয়ে বলেন,—পাপী ধর্মের শত্রু নয়। পাপই ধর্মের শত্রু। পাপীর দেহে ও মনে পাপ অবলিপ্ত থাকে বলেই পাপীকে নিশ্চিহ্ন করেই পাপকে নিশ্চিহ্ন করতে হয়। শাস্তি, তাকে অনু-শোচনার সুযোগ দেয় যাতে ইহজন্মে পাপক্ষয়ে পরজন্মে শান্তি-লাভ করতে পারে।

মৃত্যু বলেন, ধর্মরাজের মহত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করে না পাপীরা। নরক যে তাদের মুক্তির পথ,—এ কথা বুঝতে চায় না। সন্ত্রস্ত শ্বাপদ যেমন ধীরে ধীরে সরে যেতে চায়, তেমনই পাপীগণ মুক্তির পথ থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে চায়। ধর্মরাজ বলেন,—কিন্তু তাদের পলায়নের পথ কোথায়। আমার দৃষ্টি সর্বব্যাপী। শত নৃপতির শত চক্ষু আমার কাজে লিপ্ত। পাপীর আবাসভূমিই নরক। ত্রিভুবনে

ছড়িয়ে আছে সেই নরক। মৃত্যু, তোমার কর্তব্যও ত্রিভুবন ব্যাপ্ত। নৃপতিগণ তোমার সহায় আছেন।

ধর্মরাজের অমোঘ নির্দেশে শত শত পাপী বন্দী হয়ে আছে মৃত্যুর কারাগারে! অসহনীয় অত্যাচারে তাদের তীব্র যন্ত্রণাক্ত হৃদয় চিরমুক্তি চায়। মৃত্যুর চাইতেও ভয়ানক এই অনুশোচনা পর্ব। দিকে দিকে শুধু আর্তনাদ আর হাহাকার। সেই আর্তনাদ ডুবে যায় পিশাচের বীভৎস আনন্দোল্লাসের ধ্বনিতে। মহাকালের বক্ষে ইতিবৃত্তের পত্রে কোন্ ধ্বনিটিকে বাঁচিয়ে রাখবেন সে কথাটি জানেন শুধু ধর্মরাজ। আর জানেন শুধু স্বর্গ-মর্ত্যের নৃপতিমণ্ডলী।

মর্ত্যভূমের মতই কালচক্র রচনা করে যান দিবস রজনী নরকের আকাশে। কিন্তু বৃথা। সে আকাশের রূপ নেই, রস নেই, আছে শুধু আর্তক্রন্দন। কেঁদে কেঁদে ফিরে যান সোম আর সবিতা।

হঠাৎ যেন মৃত্যুর বিভীষিকায় ভয়ার্ত কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে এক পাপী। প্রেতকিঙ্করগণ সবলে তাকে নিক্ষেপ করেছে ক্ষার-স্রোতে। এই বীভৎস বিশ্বেও সে বাঁচতে চায়। শত দুঃখময় হলেও সে জীবনকে ভালবাসে। মরতে সে চায় না, তবুও তাকে মরতে হবে।—হে ঈশ্বর, এ মৃত্যু বড় ভয়ানক। আমাকে বাঁচাও।—নির্মম পরিহাসে উল্লাস চীৎকারে নৃত্য করে ওঠে প্রেতকিঙ্করগণ। যেন ধর্মরাজের শাস্তির বিধান যথাযথই পালিত হয়েছে।

মৃত্যুর মধ্যেও পাপী যেন বাঁচতে চায়। মুহূর্তের জন্য হলেও সে যেন একটু বেঁচে থাকতে চায়। নদীতীরের মৃত্তিকাটুকু স্পর্শ করেও যেন সে ক্ষণেকের জন্য বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু বৃথা। অসি-পত্রবনের সুতীক্ষ্ণ কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হয় তার দেহ। প্রেতকিঙ্করের বিচ্ছুরিত শিলায় আহত হয়ে কেঁদে ওঠে সে। তারপর ধীরে ধীরে মর্ত্যলোক থেকে মিলিয়ে যায় তার কণ্ঠস্বর। লুপ্ত হয়ে যায় হৃৎস্পন্দন। ক্ষারস্রোতে ডুবে যায় তার দেহ। উল্লাসে নৃত্য করে ওঠে প্রেত-কিঙ্করগণ।

এমনই অহর্নিশ আর্তক্রন্দনে লুপ্ত হয়ে গেছে নরকগগনের রূপ।

দূরান্তের আকাশ যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনতে পায় নরকের বক্ষ হতে উত্থিত একটা আর্তনাদ বায়ুতাড়িত ঝটিকা বিলাপের মত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে ত্রিভুবনের বায়ুমণ্ডলে। জীবনের সমস্ত সঙ্গীতকে তুচ্ছ করে সেই আর্তনাদ রচনা করে চলে একটা ধ্বংসের ঘূর্ণাবর্ত।

তপ্ত তৈলকটাহে পাপীকে নিক্ষেপ করে প্রেতকিঙ্করগণ উল্লাস-চীৎকারে বলে ওঠে—ধর্মরাজের জয় হোক। পাপের শাস্তি ভোগ কর পাপিষ্ঠ নরাধম।—সেই ফুটন্ত তৈলতরঙ্গে মুহূর্তের জন্য শুনা যায় পাপীর এক বীভৎস আর্ত চীৎকার। তারপর সব স্পন্দন শেষ হয়ে যায়। তারপর শুধু ডোবে আর ভাসে বিগলিত-চর্ম একটা নরদেহ। পাপের শাস্তি ভোগ করে ধর্মরাজের ন্যায় বিচারের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে গেল সে।

প্রজ্বলন্ত অগ্নিশলাকাঘাতে আহত তীব্র দহন-জ্বালা-কাতর পাপী নিরন্তর তীব্র আর্ত চীৎকারে বলে,—হে অনলদেব, ক্ষণকালের জন্য কৃপা কর। আমার জ্বালা নিবারণ কর। অথবা এই মুহূর্তে আমার প্রাণশক্তি হরণে চিরমুক্তি দাও।

সেই দহন ক্ষতে সৈন্ধব সিঞ্চন করে উল্লাসে নৃত্য করে বলে ওঠে কিঙ্করগণ,—ধর্মরাজের সূক্ষ্ম বিচারে তোর পাপ লাঘব হোক পাপী। পরজন্মে তোর মুক্তির পথ সুগম হবে। এই লবণাক্ত শান্তিবারিতে শান্ত হবে তোর দেহ।

প্রেতকিঙ্করের বীভৎস ব্যঙ্গ শুনতে আর প্রতীক্ষা করে না পাপী। পৃথিবীর বায়ু পরিশোধ করে স্তব্ধ হয়ে যায় তার হৃৎপিণ্ড।

পাপের এই বিষণ্ন পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার দুঃসাহসী কল্পনাও সে করে নি। সে শুধু চেয়েছিল মৃত্যু এত ভয়াবহ না হয়ে হোক নিমেষে নিঃশেষিত। পাপীর এ সামান্য আবেদন নির্মমের মত প্রত্যাখ্যান করেছেন ধর্মরাজ।

সকরুণে সে আবেদন করেছিল কিঙ্করের কাছে—হে কিঙ্কর! তোমরাই আমার সাক্ষাৎ যমদূত। তোমরা অস্ত্রাঘাতে আমাকে নিমেষে নিঃশেষ করে সারমেয় দিয়ে ভক্ষণ করাও।

শিহরিত হয়ে ওঠে কিঙ্করদের বক্ষপঞ্জর। ভয়ে ক্রোধে চীৎকার করে তারা বলে ওঠে—পাষণ্ড! ধর্মরাজের নির্দেশের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে আমাদেরও পাপী বলে চিহ্নিত করতে চাস্। আমাদের ভাগ্যেও তোর পরিণতি ঘটাতে চাস্।—বলে ক্ষুধায় ক্ষিপ্ত সারমেয়দের তাড়িয়ে দেয় অর্ধপ্রোথিত যুবকের দেহ নির্দেশ করে। যুবকের তীব্র আর্ত চীৎকারে বিদীর্ণ হয়ে যায় আকাশের বক্ষ। সারমেয়দল ছিন্নভিন্ন করতে থাকে যুবদেহের মাংসপিণ্ড। উল্লাসে নৃত্য করতে থাকে কিঙ্করগণ।

বেত্রাঘাতে জর্জড় বিদ্রোহী যুবক মৃত্যুর বিভীষিকা দেখতে পায়। হঠাৎ কি জানি, কেন জানি বেত্রহস্তে কিঙ্কর থমকে দাঁড়ায়, ক্ষান্ত করে তার বেত্র সঞ্চালন। বেত্রাহত যুবক অতি ক্লান্ত কণ্ঠে বলে,—কি সুখে কিঙ্কর তোমরা আত্মবিক্রয় করেছ? বিক্রয় করেছ তোমাদের বিবেক?

উত্তর দেয় সে,—আমার অধীনদের উদরপুর্তির জন্য।

—আমায় হত্যার পর তুমি কি আমার অধীনদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে? অথবা তোমার ধর্মরাজ কি আমার বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন? অথবা তোমার অবর্তমানে তোমার স্ত্রী-পুত্রের দায়িত্বভার কি তিনি গ্রহণ করবেন?

—না-না, তুমি রাজদ্রোহী, তুমি বুদ্ধিমান, তুমি আমাকে দুর্বল করতে চেষ্টা করছ। —বলে পুনরায় কঠোর মুষ্টিতে বেত্রোত্তলন করে কিঙ্কর। অতি কাতর বিনয়ে যুবক বলে,—শোন বন্ধু, আমার মৃত্যু নিশ্চিত আমি জানি। আমার শেষ অনুরোধ কিঙ্কর, আমার মৃত্যুর পর আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতার বিলাপ আর স্ত্রী-পুত্রের অশ্রুমোচনের ভার তুমি যেন গ্রহণ কর।

হঠাৎ চমকে উঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত থমকে দাঁড়ায় কিঙ্কর। আত্ম-চিন্তায় কি যেন ভাবে। 'বন্ধু' সম্বোধন যেন তার মরুহৃদয়ের অন্তর্লোকের কোন এক নম্র কক্ষে আঘাত করে। দ্রব-অন্তরে সে বলে,—আমি কি কারও বন্ধু হতে পারি! আমার ন্যায় নিষ্ঠুরের পক্ষে কি

কারও বন্ধু হওয়া সম্ভব! লোকসমাজে বড় নিন্দিত যে আমরা!—বড় বেদনাক্ত ধ্বনি ফুটে ওঠে কিঙ্করের কণ্ঠে।

—বন্ধু, তুমি নিষ্ঠুর নও। তোমার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে লুকিয়ে আছে একটা মানুষ। সমাজের নিষ্ঠুরতাই তোমাকে নিয়ে এসেছে এই নিষ্ঠুর পথে।

স্পন্দনহীন স্তব্ধ এক শিলামূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে কিঙ্কর। ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে তার চক্ষু, রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার রক্তমাংসের শরীর। অতি সন্তর্পিত কণ্ঠে বলে,—বন্ধু, আজ অমানিশার অন্ধকারে তুমি তোমার পথ বেছে নিও। আমাকে বিপদাপন্ন না করে তুমি মুক্তির পথ অন্বেষণ করে নিও। আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম। —বলে, অতি-চিন্তা-বিষণ্ণতা নিয়ে ধীরে ধীরে চলে যায় কিঙ্কর।

॥ ৭ ॥

সাংবাদিকশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ এসেছিলেন। লঙ্কা পরিক্রমার শেষে তিনি এসেছিলেন ধর্মরাজের কাছে। ধর্মরাজের বদনে সংবাদ সংগ্রহের কোন উৎসুক চঞ্চলতা দেখা গেল না। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলেন দেবর্ষি। জিজ্ঞাসা করলেন ধর্মরাজকে—আপনার নিরুদ্বিগ্নতা দেখে মনে হয় আপনার রাজ্যের সর্বাঙ্গীন কুশল বার্তাই আছে।

—ধর্মরাজ্যের কখনও কোন অকুশল বার্তা থাকতে পারে না, এ সত্যটা অবশ্যই দেবর্ষির জ্ঞাত।—সদম্ভে বলেন ধর্মরাজ।

—ধর্মরাজ যম, যদি রাক্ষসরাজ রাবণ আপনার রাজ্য আক্রমণ করে?—কিঞ্চিৎ কৌতুক মিশ্রিত করে বলেন দেবর্ষি নারদ।

নিতান্ত তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ধর্মরাজ উত্তর করেন,—সমুচিত সম্বর্ধনাই লাভ করবেন রাক্ষসরাজ রাবণ। রাক্ষস রাজ্যের ক্ষীণ চিহ্নটুকু পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করবার বাসনা যদি তার অন্তরে জেগে থাকে তবে তাই হবে।

—শুনেছি, সে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ দূর করে এক সম-সমাজের প্রবর্তন করতে উদ্যোগী হয়েছে। স্বর্গ-নরকের ব্যবধান লুপ্ত করে সকলের জন্য সমসুখ-স্বর্গের পথ ও পন্থা উদ্ভাবন করতে প্রয়াসী হয়েছে সে।

ধর্মরাজ ব্যঙ্গহাস্যে বলেন,—পাপিষ্ঠের যদি নরকবাসের বাসনা হয়ে থাকে তবে অবশ্যই স্থান করে দেব।

—ধর্মরাজ, রাক্ষস যদি আপনার রাজ্য আক্রমণ করে, তা থেকে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করেছেন কিছু?

নিতান্ত উপেক্ষা ভরেই ধর্মরাজ বলেন,—বিশ্বাস করি না। সে কথা কল্পনা করাও অবাস্তব দেবর্ষি নারদ! বিচক্ষণ রাক্ষসরাজ অবশ্যই জানেন, ধর্মরাজের দুই বাহুর দুই মহাশক্তি রাজতন্ত্র আর বৈশ্যতন্ত্র। তথাপি যদি কল্পনাশ্রয়ী রাবণ ক্ষমতার দম্ভে নিতান্তই মূঢ়তাবশতঃ

শার্দূললাঙ্গুলে কর্ণমূল পরিষ্কার করতে উদ্যত হয় তবে নিশ্চয়ই অপরিণামদর্শী অর্বাচীনের মত পরিণাম ফল ভোগ করবে সে।

—শুনেছি তাঁর সকল পরিকল্পনাই সেই নীতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে রচিত।

—মূঢ় যদি একটা অসম্ভবের পশ্চাতে ধাবিত হয়ে নিজের অকল্যান করে, তবে তাকে একমাত্র ধ্বংসের দেবতা ভিন্ন কেউ রক্ষা করতে পারে না। জানি, পাপিষ্ঠ ত্রিভুবনে বহু অন্যায় সংঘটিত করে চলেছে। ধর্মরাজ্য স্পর্শ করলেই তার ধ্বংস অনিবার্য জানবেন। তবে আপনার এ সংবাদ আমি বিশ্বাস করছি না দেবর্ষি নারদ।

সেদিন তাঁর যথাকর্তব্য সম্পাদন করে ফিরে গিয়েছিলেন দেবর্ষি।

ধর্মরাজও বিস্মৃত হয়ে গেছেন। সেদিনের সে কথায় বিচলিত হন নি বলেই স্মরণে রাখার প্রয়োজনও বোধ করেন নি।

কিন্তু সেদিন যখন ধর্মরাজের প্রমোদ ভবনে চলছিল প্রমোদোৎসব, নৃত্যপরা শত পণ্যার নূপুর নিক্কণে মদন-পীড়িত হয়ে উঠেছিল দেব-পুরুষদের হৃদয়, সোমপানে মত্ত ভগবন ধর্মরাজ মত্ত ছিলেন পণ্যার অধর চুম্বনে, নগ্ন উর্বশীতে কামক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র, কুবের মত্ত ছিলেন মেনকায়, চলছিল মাধ্বী-মত্ত নারী-পুরুষের নগ্ন কাম সংলাপ, তখন হঠাৎ ধর্মরাজের সমস্ত কপট ন্যায়ধর্মের বেষ্টনী চূর্ণ করে দিতে অমানিশার অন্ধকারে একটা দারুণ তপ্ত মরুঝঞ্ঝা যেন এসে আঘাত করে ধর্মরাজ্যের হৃৎপিণ্ডে। শত ক্রুদ্ধ অভিশম্পাৎ যেন মিলিত হয়ে এসে আছড়ে পড়ছে ধর্মরাজ্যের ভাগ্যাকাশে। একটা দারুণ আক্রোশ যেন অগ্নিবলয় রচনা করে বেষ্টন করে ফেলেছে ধর্মরাজ্য। লক্ষ লক্ষ বজ্রনাদ আর লক্ষ লক্ষ অগ্নিশিখা যেন ছুটে এসে দগ্ধ করে দিতে উদ্যত হয়েছে সকল ধর্মের হৃৎপিণ্ড। আর্তনাদ আর হাহাকারে পীড়িত হয় ধর্মরাজ্য।

সেই আর্তনাদ আর হাহাকার কলুষে ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে প্রমোদ-ভবনের আনন্দবায়ু। বুঝে উঠতে পারেন না ধর্মরাজ—ত্রিভুবনের কোন আর্তনাদ কোনদিন যে রাজ্যের শান্তি স্পর্শ করতে সাহসী

হয় নি আজ কোন্ দুঃসাহসীর এই স্পর্ধিত অভিযান?—অতি বিস্মিত ও অতি চিন্তিত হয়ে একথা ভাবেন ধর্মরাজ।

আর্তনাদ আর কোলাহল কিন্তু থামে না। অগ্নিবলয় বেষ্টনী যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে। ক্রুদ্ধ ঝঞ্চার তপ্ত বায়ু প্রমোদ-ভবনের স্বর্ণস্তম্ভেও বুঝি এসে আছড়ে পড়ে। ত্রাসজড়িত কিঙ্কর উর্ধ্বশ্বাসে এসে ধর্মরাজকে জ্ঞাপন করে—দুরন্ত রাবণ আঘাত করেছে ধর্মরাজ্যের হৃৎপিণ্ডে। নিদারুণ ধ্বংসের তাণ্ডবে মত্ত হয়ে এগিয়ে আসছে সে।

এক লহমায় স্তব্ধ হয়ে যায় প্রমোদ-ভবনের মত্ত উল্লাস। দারুণ কোলাহল ওঠে প্রমোদ-ভবনে। ভীতার্তের কোলাহল। মুহূর্তে বীর-শূন্য হয়ে যায় প্রমোদ-ভবন। পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টের মত পণ্যাদের পরিত্যাগ করে পলায়ন করেন বীরাগ্রগণ্য ইন্দ্রাদি দেবগণ। ভীতার্ত পণ্যাদের আর্তক্রন্দনরোলে বিষাদক্লিষ্ট হয়ে যায় প্রমোদ-ভবন। ভগবান ধর্মরাজের ভাগ্যে নেমে আসে দারুণ দুর্দৈব।

রাবণের অভিযানে ধর্মরাজের দম্ভের সৌধ চূর্ণ হয়ে যায়। প্রাসাদ অলিন্দে শিলামূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন পাপিষ্ঠ রাবণের অগ্নিবলয় অভিযান।

হৃদয়ের সমস্ত প্রসারতা আকাশের মত উদার দিগন্ত বিস্তারিত করে রাবণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন—ত্রিভুবনের সমস্ত পাপীদের মুক্তি দেব আমি।

দুরন্ত ঝটিকার বেগে গিয়ে দাঁড়ান নরকের দ্বারে। তাঁর ক্রুদ্ধ পদাঘাতে লৌহকবাট তীব্র কর্কশ আর্তনাদে ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়ে ভূতলে। ভীমরবে নরকের পাপীদের মুক্তি ঘোষণা করেন রাবণ।

প্রাসাদ অলিন্দে দাঁড়িয়ে ধর্মরাজ ভাবছেন,—রাবণ আমার জীবনে একটা বিদ্রূপবহ্নি। তাতে ত্রিভুবনের সমস্ত ন্যায়ধর্মের প্রতি ব্যঙ্গ আছে আবার দহন-জ্বালাও আছে। একটা মাত্র অভিযানেই ত্রিভুবনের সমস্ত ন্যায়ধর্মের আবরণটাকে উন্মোচিত করে লোকসমাজে একটা নগ্ন প্রতারণার বীভৎস মূর্তির রূপ উদ্ঘাটিত করে দিল সে।

আরও কি যেন ভাবতে ভাবতে ধর্মরাজ কালদণ্ড আর মৃত্যুকে আহ্বান করলেন।— বীরগণ, কোনদিন যা ভাবতে পারি নি তা আজ চক্ষুর সম্মুখে সত্য বলে উপস্থিত হয়েছে। হীনাচারী রাক্ষসরাজ পাপিষ্ঠ রাবণ ধর্মরাজ্য আক্রমণ করেছে। একটা আক্রমণ বা জয়ই বড় কথা নয়। ভয়েরও নয়।

কালদণ্ড—তবে ?

ধর্মরাজ—সে একটা ভয়ানক নীতির কথা বলছে। শাস্ত্রজ্ঞানী দেবর্ষি নারদ পাপিষ্ঠের সেই নীতির কথা আমাকে বলেছিলেন। আমি তখন উপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু আচম্বিতে তা আজ আমার কাছে সত্যরূপ নিয়ে এসেছে।

কালদণ্ড—কি সেই নীতি ?

ধর্মরাজ—স্বর্গ-নরককে এক সমসুখের সমান্তরাল রেখায় স্থাপনার নীতি। রাজ্যশাসনে রাজা-প্রজাকে এক সমতল ভূমিতে স্থাপনের নীতি। যে নীতি ত্রিভুবনের সমস্ত নৃপতিবৃন্দের মৃত্যুডঙ্কা, যে নীতি আর্য ধর্ম, আর্য শাসন সংহিতার বিরুদ্ধে একটা মূর্ত প্রতিবাদ। ধর্মরাজ্য আক্রমণ আর নরকের পাপীদের মুক্তির মধ্য দিয়ে সে তার উদ্বোধন করতে চায়। এই মুহূর্তে ধৃষ্টের সেই পাপ পরিকল্পনার সমূল বিনাশ ঘটাতে না পারলে ত্রিভুবনে রাজশাসনের সমূহ বিপদ। কিন্তু তাঁরা যে সকলে প্রমোদ-ভবন ত্যাগ করে আমাকেও পরিত্যাগ করে পলায়ন করলেন! —একটা দারুণ আতঙ্ক ধ্বনিত হয় ধর্মরাজের বক্ষের ভাষায়।

নিশান্তের অন্ধকার দূর হয়। কিন্তু ধর্মরাজের মনের অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়। সেই অন্ধকারে ফুটে ওঠে একটা বিভীষিকার দ্যুতি। একটা গভীর বিষণ্ণতা অবলিপ্ত হয় তার বদন মণ্ডলে। —কিন্তু দুরন্ত রাবণ দ্রুত এগিয়ে আসছে। সময় যে আর নেই। আমি অসহায় বিপর্যস্ত বোধ করছি।

শুনতে পাওয়া যায় দুরন্ত মৃত্যুর হুঙ্কার।—ভগবন, আমাকে

মোচন করুন। এই মুহূর্তে আমি পাপিষ্ঠকে দুরন্ত ক্ষার নদীতে নিক্ষেপ করি, অথবা তপ্ত তৈলকটাহে।

আগ্নেয়গিরির মত বিস্ফোরিত হয় জলদগ্নি তুল্য কালদণ্ড। —ভগবন, আমি একটা মূর্তিমান পাপকে সমাজদেহ থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে চাই। আমাদের রণযাত্রার আজ্ঞা করুন ধর্মরাজ। পাপিষ্ঠকে প্রতিহত করতে, ধ্বংস করতে আদেশ দিন।

ধর্মরাজ্যের আকাশে এক ঘূর্ণিঝঞ্ঝা সাড়ম্বরে ঘনীভূত হয়। পরিণাম-ভয়ে ত্রিভুবনের বক্ষপঞ্জর অসার হয়ে যায়।

মর্ত্যভূমির বক্ষে ধ্বনিত হয় একটা দারুণ সংঘাতের বার্তা। এ সংঘাত শুধুমাত্র রাজ্যজয় আর রাজ্যবিস্তারের সংঘাত নয়। এ সংঘাত একটা নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা আর আদর্শ বিস্তারে রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সংঘাত। সমাজের সমস্ত কলঙ্ককালিমা মুক্ত করে একটা নতুন নীতি প্রতিষ্ঠার সংঘাত—সে নীতি সমদর্শিতার নীতি, লোক-কল্যাণের নীতি, সমাজ-কল্যাণের নীতি।

ঝঞ্ঝাহত বনানীর পত্রমর্মরের মত রাবণের নবনীতি মর্মরিত হয়ে ওঠে ত্রিভুবনের অন্তরে। একটা আশ্বাস গুঞ্জরিত হয় নিঃস্বের হৃদয়ে।

অস্ত্রের ঝঙ্কার, রণের হুঙ্কার, আর্তের কলরব আর আর্তনাদে আচ্ছন্ন হয়ে যায় ধর্মরাজ্যের আকাশবায়ু। লক্ষ লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন উল্কাবেগে ধেয়ে চলেছে শমনবার্তা নিয়ে ধর্মরাজ্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। অম্বরডমরুর মত বেজে ওঠে রণবাদ্য। সুরু হয় সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠার এক মহারণ।

রাবন যেন এক মূর্তিমান সংহার। শত শত অগ্নিবাণের জ্বালা আর মৃত্যুর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে উল্কার গতিতে তাঁর রথ এসে দাঁড়ায় যমের সম্মুখে। রথে দণ্ডায়মান রাবণ যেন এক নীলাঞ্জনবর্ণ সুবিশাল শিলামূর্তি। তাঁর সুবিশাল বক্ষোপট যেন শিলাবর্ম। লক্ষ লক্ষ বর্শাফলক যেন তাঁর ঐ বক্ষোবর্মে প্রতিহত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আর্তক্রন্দনে মার্জনা ভিক্ষা করতে করতে লুটিয়ে পড়বে পদতলে।

মনে হয় এক বজ্রমুষ্টাঘাতে তিনি চূর্ণ করে দিতে পারেন ত্রিভুবনের বক্ষ।

শিলামূর্তি যেন সহসা চঞ্চল হয়ে ওঠে। যমকে লক্ষ্য করে তর্জনী নির্দেশে মেঘরবে রাবণ বলতে থাকেন—শোন দেবকুলের পদলেহী ধর্মের প্রতারক ভ্রষ্টাচারী যম,—আমি পাপহন্তারক, যমের যম, মৃত্যুর মৃত্যু, কালদণ্ডের কাল—রাবণ। আমি চিরতরে ছিন্ন করে দিতে এসেছি তোমাদের ঐ প্রতারণার তন্তুজাল। ভেঙ্গে দিতে চাই মানুষে মানুষে ভেদাভেদের প্রাচীর। উন্মোচিত করতে চাই তোমার প্রতারণাময় পাপ-পুণ্য বিচারের মুখোস। ঘুচিয়ে দিতে চাই স্বর্গ-নরকের মিথ্যা ব্যবধান। ক্রীতদাসের মত যাদের আজ্ঞা পালন করে পাপের বিন্ধ্যাটবী রচনা করেছ, তোমার সেই রক্ষকগণ আজ এই দুঃসময়ে তোমাকে ত্যাগ করে প্রমোদভবন থেকে পলায়ন করেছে। মূর্খ, তুমিও সেই পথ অনুসরণ কর অথবা শমনসদনে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

তীব্র অন্তর্দহনে দগ্ধ হতে থাকেন যম। রাবণের বিচ্ছুরিত বচন যেন এক একটি অগ্নিময় বর্শাফলকের মত বিদ্ধ করে দেয় তাঁর বক্ষ-পঞ্জর। অগ্নিবর্ষি দৃষ্টিতে রাবণের দিকে তাকিয়ে রণাঙ্গনের ভাষায় তিনি বলেন,—ওরে পাপিষ্ঠ দুর্মতি রাবণ, আজই ঘোষিত হবে তোর পাপনীতির অন্তিমলগ্ন। রণাঙ্গনে তোর নীতিবচনের প্রত্যুত্তর হবে অস্ত্রের মুখ থেকে।—বলে, রাবণকে লক্ষ্য করে ধর্মরাজ নিক্ষেপ করেন দারুণ অগ্নিবাণ। হিংস্র শত শ্বাপদের মত সেই বাণ শত মুখ প্রসারিত করে ধাবিত হয় রাবণকে গ্রাস করতে।

দেখে বিস্মিত হয় ত্রিভুবন যে নিতান্তই অবহেলাভরে রাবণ নিষ্ক্রিয় করে দেন সেই বাণ আর বক্রহাস্যে বলেন,—ওহে, নৃপভুবনের ক্রীতদাস বৈবশ্যৎ যম, পাপের প্রশ্রয়দাতা, শমনসদনে প্রস্থানের পূর্বে একবার আত্মজিজ্ঞাসা করে দেখ—কতজন দেবতাকে তুমি অর্ধপ্রোথিত করে ক্ষুধার্থ কুক্কুর দিয়ে ভক্ষণ করিয়েছ? পিপাসার্ত কত রাজাকে তুমি ক্ষার নদীতে নিক্ষেপ করে শাস্তি দিয়েছ? আর

নগ্নপদে তপ্ত বালুকায় অশিপত্রবনে পদশ্চারণা করতে বাধ্য করেছ কত ঋষি-মহর্ষিকে ? কত মাণ্ডলিকের দেহ নিক্ষেপ করেছ তপ্ত তৈলে ? আর কত বৈশ্যপ্রধানকেই-বা ক্ষার নদীতে নিক্ষেপ করেছ ? ভণ্ড ধর্মরাজ, স্মরণ করে দেখ, সর্বপাপের আকর ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ বা কুবেরকে কোনদিন কোন শাস্তি বিধান করেছ কিনা ! পাপীর আশ্রয়দাতা মহাপাপী ধর্মরাজ যম, আজ তোমার শাস্তির দিন। তাই গ্রহণ কর।—বলে চপল চপলতায় শত শত তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলেন রাবণ।

প্রচণ্ড ধূলিবাত্যার তাড়নার মত অস্ত্রনির্গত অগ্নিবাত্যার তাড়নায় অস্থির হয়ে বলে ওঠেন ধর্মরাজ—কী ভয়ানক, কী দুর্ধর্ষ এই রাবণ !

অর্ধচেতনায় শুনতে পান কালদণ্ডের কাতর কণ্ঠ—ভগবন ধর্মরাজ, দারুণ এই রাক্ষসরাজ রাবণ। পলায়ন ভিন্ন আর উপায় দেখছি না।

শুনতে পান মৃত্যুর ক্রন্দন,—ভগবন্, আমি শত ক্ষিপ্ত কুক্কুর-দংশনের চাইতেও ভয়ানক দংশনজ্বালা বোধ করছি। আমার দেহে যেন অনিবার তপ্ত তৈল সিঞ্চিত হচ্ছে। পলায়ন ভিন্ন পরিত্রাণের আর কোন পথ নেই ভগবন।

ধর্মরাজ কাতর কম্পিত কণ্ঠে বলেন,—আমি শত নরকের জ্বালা বোধ করছি। নরকের অন্ধকার পুরী থেকেও গভীরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে আমার দৃষ্টিপথ। আমি পলায়নের পথ দেখতে পাচ্ছি না।

—কোথায় পলায়ন করবে পাপিষ্ঠ ধর্মরাজ, রাবণ আছে পশ্চাতে। রাবণের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় দারুণ অট্টহাস্য।

ধর্মরাজের জন্য বেদনা বোধ করেন ভগবান ব্রহ্মা। মুক্তির উপায় অন্বেষণ করে পলায়নের নির্দেশ দেন। শান্ত হয় রণাঙ্গন।

* * *

হঠাৎ নিবিড় নিস্তব্ধ সমাজের নির্মল আকাশে একটা দীর্ঘপুচ্ছ

প্রজ্জ্বলন্ত উল্কার আবির্ভাবের মত রাবণের আবির্ভাব দেখতে পান মর্ত্যভূমের সকলে।

দেখে চমকে ওঠেন ত্রিভুবনের নৃপমণ্ডলী। একটা দারুণ সন্ত্রাসের স্পর্শে বিচলিত হয়ে ওঠেন তাঁরা। বিষণ্ণ হয়ে পরিণামের কথা ভাবেন। বৈশ্যগণ একটা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সংভূপের অন্বেষণ করেন। ঋষি মহর্ষিগণ আশ্রমে বসে গবেষণা করেন। সমাজবিজ্ঞানী আর রাজনৈতিক জ্যোতির্বিদগণ তথ্যানুসন্ধান করেন। আর সাধারণ জনমণ্ডলী? ভ্রূক্ষেপও করে না। তারা ভাবে, তাদের জীবন উত্থান-পতন, মঙ্গল-অমঙ্গল, সুখ-দুঃখ, সর্বকালে সর্বসমাজে এক এবং অভিন্ন দুঃখের বৃত্তেই আবর্তিত হয়। সুতরাং ত্রিভুবনে উল্কাপাত ঘটল কি বজ্রপাত ঘটল তাতে তাদের মনে অযথা ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কি লাভ।

এই উল্কা ত্রিভুবনের মনের আকাশে একটা ধূলিঝঞ্ঝার সৃষ্টি করেছে। ভীত সন্ত্রস্ত সম্পন্নমণ্ডলী যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। নৃপমণ্ডলী, ঋষি-মহর্ষি ব্রাহ্মণগণ সেই যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন। আত্মমঙ্গল কামনায় মন্ত্রোচ্চারণে আর সোমদানে অন্তরিক্ষের দেবতাকে তুষ্ট করেন। নিজেরাও তৃপ্ত হন। উৎপাত দমনের জন্য তাঁরা শলা-পরামর্শও করেন। এ অনুষ্ঠানে সাধারণের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ।

বিশিষ্ট ধার্মিকরা মনে করেন,—এ উল্কা, সমাজে এক মহাপাপ, মহা অমঙ্গল, মহা অনিষ্টের কারণ হয়েছে। সমাজ ধ্বংস করে দেবে।

শাস্ত্রজ্ঞানীরা তত্ত্ব আবৃত্তি করে বলেন, যথা সময়ে এই উল্কার বিনাশ না ঘটালে আমাদের প্রচলিত শাস্ত্র-ধর্ম-ন্যায়-নীতি সকলই লোপ পাবে।

বিশিষ্ট আস্তিক্যবাদী তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন,—পুণ্যময় এই ধরাধামে পুণ্যের প্রভাবকে বিনাশ করতেই উল্কার মত পাপী রাবণের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা বলেন. রাজা-প্রজা, উচ্চ-নীচ সমান হবে এ কেমন নীতি! বিধি নির্দিষ্ট ভেদনীতি চিরন্তন। মানুষ পাপ-পুণ্য অনুযায়ীই সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরক ফল ভোগ করে। রাবণ ধর্মদ্রোহী, পাপিষ্ঠ, দস্যু।

নাস্তিক্যবাদী পণ্ডিতরা বলেন,—দুঃখীর দুঃখে বিগলিত হৃদয় রাবণ মহাপুরুষ। তাঁর 'মানব ধর্ম'ই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। রাজা-প্রজা সকলে সম-সুখে থাকবে, সমনিয়ন্ত্রণের অধিকারী হবে এ ধর্ম এবং এ নীতিই তো পবিত্র ধর্ম ও পবিত্র নীতি। তাঁরা আরও বলেন, ঈশ্বর বিরাজ করছেন আস্তিক্যবাদীদের কল্পনার রাজ্যে। আমরা মনে করি মহৎ গুণাবলীই মানুষকে ঈশ্বরে উন্নীত করে।

আর একদল আছেন যাঁরা সত্য ও ন্যায় কি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন কিন্তু ভয়ে তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন। তাঁরা নিজেদের বলেন নিরপেক্ষ।

এ সকল কথা সবই জানেন রাবণ। শাস্ত্রজ্ঞানীরা যে যাই বলুন আর বিরোধিতা করুন তিনি তাঁর লক্ষ্যপথে উল্কাবেগে এগিয়ে চলেছেন। জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে, দশাননের বিংশতি চক্ষু দিয়ে সমাজকে দেখে এমন একটি হৃদয় তিনি গড়েছেন যেখানে নতুন করে কোন তত্ত্ব খোদিত করা অসম্ভব। তিনি গভীর ভাবে বিশ্বাস করেন, আত্মসুখের জন্য নয়, সমাজ-কল্যাণের জন্যই মানবের জন্ম ও জীবন। নিজের নয়, সকল প্রজার সুখ ও শুভর দিকে লক্ষ্য থাকবে রাজার। এ সমাজ সম্পূর্ণ এক বিপরীতধর্মী সমাজ। তাই তাঁর এ অভিযান।

ইন্দ্রাদি দেবগণ মনে করেন রাবণ হতেও ভয়ানক তদাত্মজ মেঘনাদ। এ যেন এক ভয়ানকের সম্মেলন ঘটেছে।

রাজনীতিতে প্রাজ্ঞ সুমালীর শিক্ষায় লালিত রাবণ ত্রিভুবনের রাজনৈতিক আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধুমাত্র তাঁর শত্রুর অস্তিত্বই উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাই নয়, তাকে নিধনের ষড়যন্ত্রের কথাও অনুমান করতে পেরেছেন। তিনি তাঁর বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ অলকাপুরী-বাসী কুবেরের কাছ থেকে তীক্ষ্ণ ও অতিকটু তিরস্কারলিপিও পেয়েছেন। তাতে তাঁকে নিধন-ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে প্রচ্ছন্ন ভাবে। এ অত্যন্ত অন্যায় অবৈধ ও গর্হিত বলে তিনি মনে করেন। মনে করেন, এ লিপি এক বৃহৎ ষড়যন্ত্রের পদক্ষেপ মাত্র।

হ্যাঁ, এ লিপির প্রত্যুত্তর আমি দেব তবে লিপিতে নয়। কারণ লিপি মাধ্যমে প্রত্যুত্তরের স্থান নেই কুটিল কুবেরের এই ইঙ্গিত পত্রে। তাতে প্রচ্ছন্নভাবে আছে অস্ত্রে প্রত্যুত্তরের ভাষা।

তাঁর উত্তেজনাময় অস্থির চক্ষুর দৃষ্টি মৃগয়ানুসন্ধানী ব্যাধের মত তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করতে থাকে লিপিতে কোন স্নেহলিপ্ত ভব্য ভাষা আছে কিনা। বারংবার পাঠ করতে থাকেন।—'তুমি এযাবৎ যা দুষ্কর্ম করেছ তাই পর্যাপ্ত, এখন যদি পার তো সচ্চরিত্র হয়ে ধর্মাচরণ কর। আমি তপস্যার জন্য হিমালয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে দেবী রুদ্রাণীকে দেখে ফেলি, তাতে আমার দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ এবং বাম চক্ষু ধূলিকলুষিত ও পিঙ্গলবর্ণ হয়ে যায়। তারপর আমার বহুবর্ষ-ব্যাপী কঠোর তপস্যার বলে মহাদেব প্রীত হয়ে বললেন,—তুমি আর আমি ভিন্ন এই দুষ্কর তপস্যা কেউ করতে পারে না, তুমি আমার সখা হলে। শঙ্করের সান্নিধ্য লাভ করে ফিরে এসে তোমার পাপা-চারের কথা শুনলাম। দেবতা আর ঋষিগণ তোমার বধের উপায় চিন্তা করছেন। তুমি কুলদোষজনক অধর্মাচরণ থেকে নিবৃত্ত হও।'

ঘৃণাকুঞ্চিত ললাটে রাবণ ভাবতে থাকেন,—চরম ভ্রষ্টাচারী, পরসম্পদ লুণ্ঠক, গর্হিত দুষ্কর্মের আধার চির অসচ্চরিত্রের এই লিপি-ভাষা যেন এক পরিচ্ছন্ন বিদ্রূপের ভাষা। নারীর সেই রুদ্রাণী রূপের দিকে কি উদ্দেশ্যে বা কোন্ কলুষ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলে তুমি, হে ধনপতি লম্পটরাজ কুবের, তা আর কেউ বুঝতে না পারলেও আমি বুঝতে পারি। শঙ্করের সান্নিধ্য লাভ করেছ সে সংবাদে আমাকে ভীত ও দুর্বল করতে চাইছ তুমি কাপুরুষ? দেবতা আর ঋষিগণই নন, তুমিও আমার নিধনে প্রয়াসি হয়েছ সে সংবাদ আমি জানি। সর্বজনে সমদর্শিতা তোমাদের কুলদোষজনক অধর্মাচরণ হতে পারে কিন্তু মানবকুলদোষজনক অধর্মাচরণ নয়! আর সহ্য করতে ইচ্ছা হয় না। ইচ্ছা হয়, অদৃশ্য ঐ লুব্ধকের দুঃসাহস আর কূট অভিসন্ধিকে আঘাত করে এখনই নিঃশেষ করে দেই।

কুবের আর অলকা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর চিন্তাকাশে। বক্র

ক্রভঙ্গ চিন্তায় অভিযানের উপায় অন্বেষণ করতে থাকেন। হঠাৎ অভিনব এক প্রত্যয়ের দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর বদনমণ্ডল। যেন তাঁর বুদ্ধি, দুশ্চিন্তা সাগরের তটভূমি স্পর্শ করতে পেরেছে। মাতাব সেই বিস্মৃত আবেদনেরও মর্যাদা রক্ষার পথ খুঁজে পেয়েছেন। কুবেরপুরী অভিযানে মাতামহ সুমালীকে সৈনাপত্যে বৃত করে মাতার এই আবেদনের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবেন। সুতরাং যক্ষপুরী অভিযানে সুমালীই হবেন যোগ্যতম নায়ক। সুমালী বৃদ্ধ হলেও তাঁর নবজীবনে তারুণ্যের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। এখনও তাঁর লৌহদৃঢ় মুষ্টিতে চপলার মত নৃত্য করে অসি। এখনও তিনি দেবতাদের আতঙ্ক। কুবের একদা তাঁরই লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করে লঙ্কাকে শোষণ করে সম্পদশূন্য করেছে। তাঁরই স্নেহপুষ্ট কন্যা কৈকশী নির্যাতিতা-লাঞ্ছিতা মর্যাদাহতা হয়েছেন বিশ্রবার আশ্রমে। সেই কন্যার সপত্নী-পুত্র যক্ষাধিপ কুবেরের আলকাপুরী অভিযান পরিচালনা করবেন তিনি। কুবেরের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ আর ক্রোধই হবে মহা অস্ত্র।

চতুর অহিতুণ্ডিক খল বিষধরকে যেমন বিবরচ্যুত করে দন্ত উৎ-পাটনে নির্বিষ করে, তেমনই দেবরাজ আর যক্ষরাজকে স্বর্গভ্রষ্ট করে হরণ করতে হবে প্রতারণার উপর রচিত তাদের মিথ্যা দম্ভের সৌধ। নিরাবরণা করতে হবে ভ্রষ্টাচারীদের ঐশ্বর্যপুরী। আকাশভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত স্বর্গভ্রষ্ট করে চূর্ণ করতে হবে তাদের মিথ্যা মানের গৌরব আর গর্ব।

* * *

অলকাপুরবাসিগণ বিস্ময়ে একদিন উপলব্ধি করতে পারেন যে, রক্ষোপতি রাবণের ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস যেন যক্ষনিকেতনের বক্ষপঞ্জর চূর্ণ করে দিতে অকস্মাৎ এক তপ্ত রোষঝঞ্ঝার মত দ্রুত এগিয়ে আসছে। আঘাত হানতে চায় অলকাপুরীর হৃৎপিণ্ডে। এক মহাদস্যু যেন অলকার শীতল বক্ষের রত্নস্তন পীড়ন করতে উদ্যত হয়েছে।

'এই ধর্ষকের কলুষস্পর্শ থেকে রত্নময়ী অলকাকে রক্ষা করবার উপায় দেখেন না যক্ষাধিপতি কুবের। সাহায্যপ্রার্থী হয়ে গিয়েছিলেন বিষ্ণুর কাছে। বর্তমান বিপদকে উপেক্ষণীয় বলে, ভবিষ্যতের আশ্বাস দিয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন বিষ্ণু। তিনি বলেছেন,—তোমার বর্তমান বিপদ সামান্য, তুমি একাই তা প্রতিহত করতে পারবে। ভবিষ্যতে যথাসময়ে আমি সেই পাপিষ্ঠকে নিধন করব।—বিষ্ণুর এই আশ্বাসবাণী কুবেরের হৃদয়ে বিদ্রূপের মত মনে হয়।

ক্রমে ক্রমে সেই ঝঞ্ঝার আঘাত ঘনীভূত হয়ে আসতে থাকে। অলকার আকাশে রক্ষোসেনানীর অট্টহাস্য শুনতে পাওয়া যায়। যেন ঝঞ্ঝাতাড়িত অযুত পত্রমর্মর ধ্বনি। অলকার শান্তি যেন হঠাৎ উচ্চকিত ত্রাসের ধ্বনি তোলে।

রাবণের ক্রোধ যেন সহসা এসে আছড়ে পড়তে লাগল অলকার বক্ষের রত্নস্তূপে। কৈলাশ শিখরের হেমবিন্দু নয়, লক্ষ লক্ষ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ঝড়ে পড়তে থাকে মনিস্তবকিত অলকার বেণীবন্ধে। লক্ষ লক্ষ অনল-শিলার আঘাত যক্ষনিকেতনের হৃৎপিণ্ড যেন চূর্ণ করে দিতে থাকে।

যক্ষরাজের জীবনের সমস্ত বাসনাগুলি যেন অকস্মাৎ এক কঠোর পরিহাসের আঘাতে আর্তনাদ করে ওঠে। এক মহা হুতাশনের আক্রোশে যেন দগ্ধ হয়ে যেতে থাকে যক্ষরাজের রত্ন পঞ্জর।

নির্নিমেষ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে অলকাপুরীর দিকে তাকিয়ে সেনাপতি সুমালী বলেন,—বৎস রাবণ! ঐ মেঘবক্ষে হাস্যময়ী সৌদামিনীর মত শোভমানা অলকাপুরী, যার মণিময় উজ্জ্বল স্বর্ণচূড়া অরুণোদয়ে হৈমবতীর সপ্তবর্ণা মণিময় কীরিট বলে ভ্রম হয়, ত্রিভুবনের এই বিস্ময় কি ধ্বংস করা সমাচীন ?

—মাতামহ, ত্রিভুবনে সুন্দর সৃষ্টি ধ্বংস করা আমার নীতিবিরুদ্ধ। ধ্বংস নয়, হত্যা নয়, আপনি ভ্রষ্টাচারী কুবেরকে শাস্তি দিন।
—ভগবন! যক্ষরাজের হৃদয়ে স্থান আছে শুধু রত্নের। নিজের জীবন

হতেও প্রিয়তর তাঁর রত্ন। মূষলাঘাত কঠিন হতে পারে কিন্তু সম্পদ হারাবার আঘাত থেকে কঠিনতর নয়! তাই, অনুরোধ, তাঁর সমস্ত সম্পদই যেন অলুণ্ঠিত থাকে। শুধু, অমরাবতী অভিযানে রথের প্রয়োজন হবে। তাই···

—উত্তম বৎস, আমি সন্তুষ্ট হলাম। আমি কুবেরগিরি অবরোধের নির্দেশ দিলাম।

অবরুদ্ধ যক্ষপুরী রুদ্ধশ্বাসে একটা ভীষণ পরিণতির প্রতীক্ষায় কাঁপছে। রক্ষোসৈন্যের অস্ত্রবর্ষণ স্তিমিত হয়ে এসেছে। থেমে গেছে অলকাপুরে গন্ধর্বের বাদিত্র নিঃস্বন। একটা নিবিড় স্তব্ধতা ছেয়ে আছে অলকার আকাশ। মাঝে মাঝে শুধু বাহ্বাস্ফোট অস্ত্রের শব্দ রাক্ষসবাহিনীর অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।

সহসা স্তিমিত আকাশে আবেগের সঞ্চার হয়। চঞ্চল হয়ে ওঠে স্তব্ধ রণাঙ্গন। যক্ষপতি সসৈন্যে অবতীর্ণ হয়েছেন রণাঙ্গনে। দেবগণের চিরবৈরী রক্ষোসেনাপতি সুমালীপ্রেরিত আত্মসমর্পণের প্রস্তাবের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে যক্ষপতি কুবের স্বয়ং এসেছেন রণাঙ্গনে।

স্বয়ং কুবেরকে আক্রমণের সজ্জায় দেখে রাবণ সংযত করতে পারেন নি রসনা। বিদ্রূপ-ভাষায় বলে ফেলেন, রত্নস্তূপের অন্তরালে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করা যায় না ধনপতি কুবের। আত্মসমর্পণ কর।

আহত শার্দূলের মত ক্ষিপ্ত হয়ে রণাঙ্গনে এসেছেন তিনি। বাক্যদহনজ্বালাকাতরের মত ক্ষিপ্ত হয়ে রাবণকে উদ্দেশ্য করে কুবের কটুভাষণে বলেন,—দুষ্টমতি রাবণ, তুমি আমার সমস্ত শাসন অগ্রাহ্য করেছ। সমস্ত উপদেশ পদে পদে অমান্য করেছ। এর ফল তুমি অবশ্যই নরকে গিয়ে ভোগ করবে।

রণাঙ্গনে এক সুবিশাল শিলামূর্তি যেন সহসা বাঙ্ময় হয়ে উঠল। সদর্পে সুমালী প্রত্যুত্তর করেন,—মর্যাদার অহঙ্কারে রণাঙ্গনের রীতি-নীতি বিস্মৃত হয়ে যেও না ধনপতি। রণাঙ্গনের সেনাপতি সুমালীকে

মর্যাদা দিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। শঙ্কাহীন, উদ্বেগহীন, অশ্রুহীন চিরহর্ষের জীবন তোমার শেষ হয়ে গেছে।

—পাপিষ্ঠ রাক্ষস, মৃত্যুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে তুমি জয়ের স্বপ্ন দেখছ। তোমার সে স্বপ্ন যে মিথ্যা তা এবার উপলব্ধি কর।—বলে সুমালীকে লক্ষ্য করে ভীমরবের বায়বাস্ত্র নিক্ষেপ করেন কুবের।

—মূঢ়, গুরুপ্রণামীর প্রত্যুত্তরে আশীর্বাদ গ্রহণ কর।—বলে ভীষণ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করেন সুমালী।—অকস্মাৎ যেন অন্তরীক্ষ থেকে এক প্রজ্জ্বলিত দাবানল ছড়িয়ে পড়তে থাকে যক্ষসেনানীর শিরে। ত্রাসে পলায়ন করতে থাকে সেনানী। কৈলাশের আকাশ চূর্ণ হয়ে যায় ত্রাসের কোলাহলে।

দিশাহীন ক্ষিপ্তের মত রাবণের বক্ষ লক্ষ্য করে প্রাণঘাতী মূষল নিক্ষেপ করেন কুবের।

রাবণের সুবিশাল বক্ষোপটে, ক্রোধান্ধ কোন শিশুর বিচ্ছুরিত শিলাখণ্ডের মত আঘাত করে সেই মূষল আর্তনাদে রাবণের পদতলে লুটিয়ে পড়ে।

—নীতিহীন দুঃসাহসের শাস্তি সহ্য কর যক্ষরাজ।—বলে, অগ্নিবর্ষী জ্বালাময় মূষল নিক্ষেপ করেন রাবণ। করাল ধূম্রপুঞ্জ আর অগ্নিজ্বালার বিভীষিকা দেখে আতঙ্কিত যক্ষরাজের সংজ্ঞা লুপ্ত হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে লুপ্তচেতন যক্ষরাজের দেহ নিয়ে পলায়ন করে সারথী। যক্ষরাজ সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত, পরাজিত, পলাতক।

হঠাৎ বন্যার জলরোলের মত রক্ষোসেনানীর বিজয়োল্লাসরোল শূন্যাকাশ ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ে ত্রিভুবনে। কেঁপে ওঠে বাসবের বক্ষপঞ্জর।

*　　*　　*

বহুবিচিত্রবর্ণশিলার সোপান, বৈদূর্যখচিত নীল স্ফটিকস্তম্ভ আর শুভ্রশিলাময় ভবন শ্রেণী, ত্রিভুবনের চক্ষুর বিস্ময় দেবরাজ ইন্দ্রের এই অমরাবতী। ইতিবৃত্তান্তে আর কাব্যকাহিনীর ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে

চিরবন্দিত এই অমরাবতী। এখানে যৌবন কখনও জীর্ণ হয় না, দেবাপ্সরাদের নৃত্যচ্ছন্দের নূপুর নিক্কণ আর গন্ধর্বের বাদিত্র নিঃস্বন কখনও থামে না। অমরাবতীর নন্দনকাননের পারিজাত কখনও ম্লান হয় না। শশী-তপনের আলোকের প্রয়োজন হয় না এখানে। চিরহর্ষ আর চিরবসন্তময় এই দেবরাজপুরী অমরাবতী। একটা অসাধারণত্ব স্পষ্ট হয়ে আছে অমরাবতীর স্তরে স্তরে। ত্রিভুবনের জড়াজীর্ণ দেহে রক্তাভ শুধু অমরাবতীর বদন মণ্ডল।

মণিময় স্বর্ণসিংহাসনে বসে ত্রিভুবনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন পুরন্দর (ইন্দ্র)। ত্রিভুবনের সমস্ত নিয়মের উর্ধ্বে তিনি। উর্ধ্বলোক হতে দেবত্বের গর্বেভরা কৃপাদৃষ্টিতে তিনি তাকান অধঃপতিত মানব-সংসারের দিকে। তাঁর বৃত্তে আবর্তিত দেব-দানব-রাজা আর ব্রাহ্মণ-দের নিয়মনিয়ন্তা বলে নিজেকে নিয়মের উর্ধ্বে রক্ষা করে চলেন তিনি। ব্রাহ্মণ আর ঋষিগণ দেবরাজের মঙ্গল কামনা আর তাঁর স্বর্গত্ব রক্ষার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। রাজা-মহারাজা-মাণ্ডলিক আর শ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠীগণ উপঢৌকন দিয়ে কৃতার্থ হন, আর স্বর্গবাস নিশ্চিত করে যান।

কেউ কখনও হেমন্তের সুনির্মল নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বর্ষার ঘনাগমের কথা ভাবেন না। বসন্তমলয়ে কেউ কখনও বৈশাখী ঝড়ের ইঙ্গিত কল্পনাও করতে পারেন না। অগ্নিস্ফুলিঙ্গে কেউ কখনও দাবানলের কথা ভাবতে পারেন না।

ধর্মরাজের পতন প্রত্যক্ষ করেও দেবরাজ কখনও ভাবতে পারেন নি এমন দুঃসাহসস্পর্ধি কেউ হতে পারে যে ইন্দ্রের অমরাবতীর বায়ু স্পর্শ করতে পারে। সুনিপুণ শিল্পী করন্যাসে স্বরযন্ত্রের বক্ষ হতে তাল-লয় সমন্বিত নাদ সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু এমন কোন নিপুণ রণশিল্পী নেই যে পুরন্দরের বক্ষে রণনাদ রচনা করতে পারে। তিনি তাঁর একনায়কতত্ত্ব ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। অভিনব কোন তত্ত্ব তিনি সহ্য করতে পারেন না। একথা জেনেও যদি কোন মূঢ় প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে হস্ত প্রসারিত করে তবে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ফল তাকে ভোগ করতে হবে।

'কিন্তু, সেদিন তিনি অকস্মাৎ অশনিশব্দচমকের মত চম্‌কে না উঠে পারেন নি, যেদিন শুনলেন রাবণ তাঁর অমরাবতী আক্রমণে অগ্রসর হচ্ছে। স্বর্গ-নরক সমন্বয়বাদী, সমদর্শীতত্ত্ববাদী ধৃষ্ট রাবণ সত্যই তাঁকে স্বর্গচ্যুত করতে উদ্যত হয়েছে। সেদিন কেঁপে উঠল তাঁর অন্তরের দেবত্বের গর্ব। আন্দোলিত হয়ে ওঠে তাঁর চিত্তোপবনে নিভৃতলীন চিন্তাপারিজাত। তাঁর চক্ষুর শ্লেষকুটিল দৃষ্টি অপসৃত হয়ে ফুটে উঠল একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক। তিনি বুঝতে পারলেন, শুধু স্বর্গই নয় ত্রিভুবনে রাজতন্ত্রই আজ বিপন্ন। নন্দনকাননের পারিজাতগন্ধ-বিধুর পরিমল যেন আজ নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস বলে মনে হতে থাকে।

নিঃসঙ্গ অরণ্যে শ্বাপদরবের আতঙ্কের মত তিনি শুনতে পান মেঘনাদের সৈনাপত্যের কথা। নিদারুণ একটা ভয়ের ঝঞ্ঝারব যেন ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। বিষণ্ণে অহর্নিশ তিনি এ কথাই ভাবছেন।

পারিজাত কাননে চন্দন তরুতলে দাঁড়িয়ে তিনি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন, এ কি সত্য অথবা কোন মিথ্যার আতঙ্ক, শুধুই মিথ্যা জনরব। ভাবতেও যেন বিস্ময় লাগে যে তাঁর অমরাবতী আক্রান্ত হতে পারে।

জনরব সত্য হয়। কলরব ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়। এ কোন উৎসব শোভাযাত্রার আনন্দ কলধ্বনি নয়, এ স্বর্গহৃদয়ের আতঙ্ক-ধ্বনি, রাজহৃদয়ের আতঙ্কধ্বনি। এতকালের উপহাস যেন আজ সত্য হয়ে অমরাবতীর অহঙ্কারের দ্বারে করাঘাত করছে। তাঁর বক্ষপঞ্জর ছিন্ন করতে আহত শার্দুল যেন ক্রুদ্ধগর্জনে অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে।

নিদারুণ একটা সঙ্ঘর্ষের শব্দে চম্‌কে ওঠে ত্রিভুবন। ত্রিদিবে শুনা যায় শুধু বজ্র নির্ঘোষ। কাঁপতে থাকে ত্রিভুবন।

এই রণে সেনাপতি মেঘনাদ কীলকাকারে বেষ্টন করে ফেলেছে অমরাবতী। জীবনে এই প্রথম নিদারুণ এক শঙ্কার আবর্তে অসাধারণ চিত্তচাঞ্চল্য বোধ করেন দেবরাজ।

বীর সুমালী আর দশানন, দুই নিপুণ রণনায়ক দুই কীলক বাহু সঙ্কুচিত করে বাসবের কণ্ঠপিষ্ট করতে অগ্রসর হচ্ছে। বসুদেব, সাবীত্রেয়, আদিত্য, মরুত্ত সকল দেবগণের বূ্যহ চূর্ণ করে ঘন সন্নিবদ্ধ হয়ে তারা এগিয়ে আসছে।

রাবণের জ্বালাকরাল দৃষ্টি নিবদ্ধ ঐ উত্তর পর্বতে, যেখানে উদ্ধত গর্বে তখনও উড়ছে ইন্দ্রের পতাকা।

বিস্মিত বাসব উদ্‌ভ্রান্তের মত রণাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে ভাবেন,—সহস্র মত্ত মাতঙ্গের বৃংহনের চাইতেও ভয়ানক নাদভেদী দেবগণের দিব্যাস্ত্র সকল উপেক্ষা করে রাক্ষস সেনানীর আগমন যেন অনায়াস হচ্ছে। শত সহস্র অগ্নিশিলা আর অগ্নিবলয় যেন আকাশের বায়ু দগ্ধ করে দিচ্ছে। তথাপি অবলীলায় যেন তারা এগিয়ে আসছে। আদিত্যের হুঙ্কার, মরুত্তের গর্জন সবই যেন বৃথা। রাবণ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে উত্তর পর্বতের দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত। তাঁর এই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য রণোন্মত্ততায় বুঝতেও পারেন নি কি এক নিদারুণ বিপর্যয়ের প্রান্তে এসে দাঁড়িছেন তিনি। বুঝতে পারেন নি তিনি অরক্ষিত ভাবে প্রবেশ করেছেন দেবব্যূহের অভ্যন্তরে। তিনি শত্রু পরিবেষ্টিত। দেববীরদের ব্যূহমধ্যে তিনি পরিবেষ্টিত। নিশ্চিত নিঃশেষের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেবরাজকে বজ্রকণ্ঠে আহ্বান করছেন সম্মুখসমরে। বুঝতে পেরে মেঘারবে মেঘনাদ চীৎকার করে উঠে বলেন,—সাবধান দেববীরগণ। প্রথমে মেঘনাদকে প্রতিহত কর।—সার্থক হয় মেঘনাদের বিপদ সময়ের কৌশল। দেববীর-গণের দৃষ্টিচমকের অবকাশে রাবণ নিজেকে সংযত করে নেন।

আচম্বিত বিস্ময়ে দেবগণ দেখতে পান বায়ুমণ্ডলে শুধু হুতাশনের ক্রোধ-লীলা। যেন এক ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত ঘটে গেছে আকাশ-মণ্ডলে। অমরাবতীর আকাশ যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। নিদারুণ তপ্ত জ্বালা ঝড়ে পড়ছে রণাঙ্গনের সর্বত্র। ভয়ে ত্রস্তে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করতে থাকে দেবসেনাগণ।

দেবরাজের দৃষ্টি হঠাৎ চম্‌কে ওঠে। আতঙ্কিত বিস্ময়ে তিনি দেখতে পান রণাঙ্গন দেবসেনাশূন্য হয়ে পড়েছে। পলায়ন করেছেন দেববীরগণ। তিনি এক ক্রুদ্ধ মৃগেন্দ্রের উদ্যত নখড়ের মধ্যে বন্দী। মেঘনাদ তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে শৃঙ্খলের উপহার দিতে। ভাবতে পারেন না, এ কি সত্য না চক্ষুর বিভ্রম। তাঁর জীবনের সকল আশা যেন হঠাৎ বুকের ভেতর চম্‌কে কেঁপে ওঠে। কঠিন ধিক্কারের ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টি তুলে তাকাতেই আবার চম্‌কে ওঠেন,—তাঁর চক্ষুর সম্মুখের সমস্ত দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে এসে দাঁড়িয়েছেন রাবণ।

বিহসিত কণ্ঠে রাবণ জিজ্ঞাসা করেন,—স্বর্গাধীশ বাসব, দেবাভিমানী ইন্দ্র, তোমাদের অহঙ্কারের সৌধ চূর্ণ হয়েছে? প্রশ্ন করেন—দেবরাজ, তোমাদের ন্যায়ের বিধান কি শুধুই শ্রেণীবিশেষের জন্য? স্বর্গ কি শুধু তোমাদেরই জন্য? বিশ্বের আপামর জনসাধারণ যদি সমসুখভোগী হয় তাতে তোমাদের দুঃখের কারণ কি? মর্তের দুঃখে কি তোমার উদার হৃদয়ের নিভৃতে কোন দীর্ঘশ্বাস জাগে না?

বাসবের বিষণ্ণ দৃষ্টি অবনত হয়। রাবণ বলতে থাকেন—দেবরাজ ইন্দ্র, তুমি বন্দী হলেও তোমার মর্যাদার অহঙ্কারে আঘাত করব না। রাক্ষসরাজ্য লঙ্কায় যাও, গিয়ে প্রত্যক্ষ কর, সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরক দূরে কি একই বৃত্তে। মেঘনাদের রথে তুমি লঙ্কায় যাও এক বৈভবহীন মর্ত্যপ্রাসাদে, যেখানে রাজপ্রাসাদে আতঙ্ক নেই, প্রজাসমাজে বিদ্রোহ নেই, অশান্তি নেই, অনাচারও নেই!

* * *

নীল সাগরের বুকে দ্বীপাবলী যেন জলদেবী বক্ষের মালিকা। সেই নিভৃত বক্ষের স্পন্দন কোন অনাদিকাল থেকে সুরে ছন্দে তালে লয়ে সঙ্গীত হয়ে কালের বক্ষে বেজে উঠেছিল, আজও যে ক্ষান্ত হয় নি সে কথা কেউ জানে না। সেই সঙ্গীত-সুরমন্দ্র, দ্বীপাবলীর সরল সবুজ বৃক্ষরাজী তন্ত্রী হয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে

কোন এক সুদূরের কল্পলোকে কে তা জানে। সেই তালে ছন্দে শুধু নৃত্য করে চলে জলদেবীর বক্ষোরূহ তরঙ্গরাজী অবিরাম লয়ে।

সেই ধ্বনি, ঐশ্বর্যের লীলাময় ছন্দে গুঞ্জরিত হয় নাগদ্বীপের রত্নপ্রাসাদে।

কিন্তু রহস্যময় ঐশ্বর্যের অন্তরালে মর্তভূমের মতই সাগরবক্ষের সঙ্গীতের অন্তরালে মিশে যায় একটা দৈন্যের ক্রন্দন রোল, বুভুক্ষার করুণ আর্তনাদ। একটা নিষ্পেষণের দীর্ঘশ্বাসও মর্তভূমের মতই মিশে যায় সারগ বায়ুতে। একটা সমসত্য যেন ছড়িয়ে আছে মর্তে, স্বর্গে কিংবা দূর সাগরের দ্বীপে। কেউ তা বোঝে না। কেউ তা জানে না। সে-ই শুধু বুঝতে পারে যার হৃদয় আছে। সে'ই শুনতে পায় নিষ্পেষিতের বেদনার ক্রন্দন যার বক্ষপঞ্জরের অন্তরালে আছে একটা বেদনাবোধের অন্তঃকরণ। সে-ই শুধু তার হৃদয়ের চক্ষু মেলে দেখতে পায় মিথ্যার আবরণে ঢাকা ঐশ্বর্যের অন্তরালের সেই সাধারণ সত্যটা, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল বা সাগরদ্বীপের অভিন্ন সেই সাধারণ সত্যটা। রাবণের সেই মহৎ অনুভব তাই স্বর্গ-মর্তের গণ্ডি অতিক্রম করে স্পর্শ করেছে সাগরদ্বীপের রত্নস্তূপের অহঙ্কার।

ইন্দ্রজয় সমাপ্ত করে ভুবনজয়ী রাবণ তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন দূর সাগরের দ্বীপাবলীর দিকে। বুঝেছেন তিনি সেখানেও লুকিয়ে আছে মর্তভূমের মতই অন্যায় আর অবিচারের কলুষ-কালিমা। নাগদ্বীপবাসীর আর্তক্রন্দন তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছে। চক্ষুতে জ্বেলেছে রোষাগ্নি। তাই নিঃসঙ্গ নাগদ্বীপের রত্নস্তূপে নাগরাজের রত্নপ্রাসাদে ওঠে আতঙ্কের হাহাকার।

নাগরাজের বক্ষোলীন হয়ে মধুমত্তা রত্নময়ী রাজমহিষী কণ্ঠালিঙ্গন দৃঢ়তর করে। ওষ্ঠসন্ধিতে বিরক্তির সঞ্চার করে সুখতন্দ্রা-জড়িত কণ্ঠে বলে দেন,—লক্ষভাণ্ড মণিরত্ন আর রত্নময়ী শত নাগ-রমণীকে উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করে দেও রত্নলুব্ধ তস্কর রাক্ষসকে।

কিন্তু অকস্মাৎ যেন ভেঙ্গে যায় তাঁর রত্নের অহঙ্কার। অবরুদ্ধ-পুরীতে অপ্রতিহতে উচ্চশিরে প্রবেশ করেন রাবণ। আতঙ্কে

চমকে ওঠেন নাগরাজ। আঁখি অবলেপে বুঝতে চেষ্টা করেন,—একি সত্য, না শুধুই আতঙ্ক।

অন্তরালে দাঁড়িয়ে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান রাজমহিষী। ধন্যা সেই নারী, যাঁর বক্ষের গর্ব এই পুরুষ। ত্রিভুবনের সমস্ত নারীর কাম-কল্পনার পুরুষ কোন্ রত্নের আকাঙ্ক্ষায় এসেছে এই নাগপুরী ধন্য করতে! অথবা স্বয়ং অনঙ্গদেব স্বর্গবাস ত্যাগ করে এসেছেন আমার জীবন ধন্য করতে! এই মহাপুরুষের সামান্য ইচ্ছার ইঙ্গিতে ত্রিভুবনের সমস্ত নারী সামান্য স্পর্শসুখের আশায় লালায়িত হয়ে লুটিয়ে পড়তে পারে ঐ প্রিয়দর্শনের বক্ষের আলিঙ্গনে। কিন্তু তাঁর ঐ পাষাণ-চক্ষুর দিকে তাকালে মনে হয় যেন ত্রিভুবনের সমস্ত কামনার ঊর্ধ্বে কোন এক অকাম্য বস্তুর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

এক নিষ্কাম কঠোর তপস্বীর মত ধীর মন্দ্রে রাবণ বলেন,—নাগরাজ, আমি উপঢৌকন প্রত্যাশী নই। আমি রাজ্যজয়ের আকাঙ্ক্ষাও করি না। আমি শুধু দুঃখী সমাজের পূজারী হয়ে লোকদুঃখকে জয় করতে চাই। নাগদ্বীপের রাজার কাছ থেকে সেই প্রতিশ্রুতিটুকু নিয়ে ফিরে যেতে চাই।

*   *   *

নাগরাজের কাছ থেকে সমদর্শিতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরছেন রাবণ। কিন্তু সহসা তাঁর গতি প্রতিহত হয়েছে দেখে বিস্মিত হন। গণ-প্রজাতন্ত্রী মণিমতিপুরের নিবাতকবচ দৈত্যপ্রধান অবরুদ্ধ করেছেন তাঁর গতি। দৈত্যপ্রধান জানেন না রাক্ষসরাজের উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্যই বা কি। রাক্ষসরাজও জানেন না দৈত্যরাজ্যের সমাজ সংগঠন কি, তাঁদের ঐ সাহস আর অপরাজেয় শক্তির উৎসই বা কি।

রাক্ষস আর দৈত্যের ঘোর রণে অনিশ্চিত জয়-পরাজয়ের মাঝে কোন এক অজ্ঞাত সত্তা এনে দেয় মৈত্রীর মাল্যবন্ধন।

সবিস্ময়ে রাবণ জিজ্ঞাসা করেন,—দৈত্যপ্রধান, আপনাদের

দুর্জয় রণশক্তিতে আমি বিস্মিত হয়েছি। বুঝতে পারি না আপনার এই দ্বীপে এত শক্তির উৎস কোথায়। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই দীর্ঘ সংগ্রামেও মর্তভূমের দরিদ্রের চিরসঙ্গী দুর্ভিক্ষ, আপনার রাজ্যে অবর্তমান।

—পরমধৈবত রাবণ, গণশাসিত দৈত্যরাজ্যে গণ-ই রাষ্ট্রের শক্তি। প্রতি প্রজা মণিমতিপুর নিজের বলে মনে করে।

কোটি স্বর্ণখণ্ড থেকেও মূল্যবান এক সত্যের বাস্তব অস্তিত্বের সন্ধান পেয়ে চম্‌কে ওঠেন সত্যসন্ধ রাবণ। প্রিয়বচনে বলেন,—মৈত্রীর উপহারের আর প্রয়োজন হবে না দৈত্যপ্রধান। যে দুর্লভ রত্নের সন্ধান আমি লাভ করলাম এর চাইতে মহার্ঘ রত্ন ত্রিভুবনে দুর্লভ। আমি শুধু দৈত্যরাজ্যে অতিথি হয়ে বহু বিদ্যা লাভ করতে চাই।

রাবণের মনে হয় তাঁর সাধনার মূর্তি বুঝি প্রাণলাভ করেছে দৈত্যরাজ্যে। মুগ্ধ হয়ে মণিমতিপুরে অবস্থান করে বহু দুর্লভ বিদ্যা আয়ত্ত করেন রাবণ। বিদায় লগ্নে দৈত্যপ্রধানকে একটা রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন রাবণ,—আপনার রাজ্যে একটা রহস্য আজও আমার কাছে রহস্যই রয়ে গেল। আপনার রাজ্যের অন্ত্যেষ্টিক্ষেত্রে একটি স্তম্ভ আজও কৃষ্ণবস্ত্রে আচ্ছাদিত রয়েছে,তাতে নিয়মিত পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে সম্মানিত করা হয়। এর তাৎপর্য জানতে বাসনা।

এই প্রশ্নে বিষণ্ণ হন দৈত্যরাজ। অনুশোচনা আর আক্ষেপভার কণ্ঠে তিনি বলেন,—রাক্ষসরাজ রাবণ, এক মহৎপ্রাণ দানব, এই দৈত্য-রাক্ষসের সংগ্রামে শান্তি ও মৈত্রীর বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। আপনার অস্ত্রাঘাতে তাঁর দেহান্ত হয়। তাঁর পরিচয় আজও অজ্ঞাত। তাই দৈত্য জাতি, সেই মহৎ প্রাণের পরিচয় উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত শোক পালন করছে।

শুনে এক অজ্ঞাত শঙ্কায় চম্‌কে ওঠে রাবণের অন্তরাত্মা।

* * *

এক পরম মৈত্রীর মর্যাদার মুকুট রাবণের শিরে শোভমান।

অন্তরে শোভমান মহাবল। জলেশ্বর বরুণের অহঙ্কার আর ভ্রষ্টাচার তাঁকে আহ্বান করছে বরুণপুরীতে।

ব্রহ্মলোকে সঙ্গীতের আসরে প্রমদা প্রমোদে মত্ত জলেশ্বর বরুণ জানেনও না কি ভয়ানক দুর্যোগের বার্তা সাগরবায়ু বয়ে নিয়ে চলেছে তাঁর রত্ন নিকেতনে। বরুণের ঔদ্ধত্য চূর্ণ করে দিতে রাবণের বিদ্রোহী বজ্রশিলা এসে আঘাত করেছে পুরর হৃৎপিণ্ডে। পুড়ে যেতে থাকে জলাধিপতির রত্ননিলয়। নিদারুণ এক ক্রুদ্ধ অভিশাপ যেন বর্ষণ করতে থাকে লক্ষ লক্ষ অনল শিলা। বরুণালয়ে হাহাকার ওঠে। জ্বালাকাতরে মন্ত্রী প্রহাস এসে বলেন,—ভগবন রাক্ষসরাজ, জলেশ্বর বরুণ গিয়েছেন ব্রহ্মলোকে সঙ্গীতের আসরে। আপনি বিজয়ী।

এক রহস্য হাস্যে রাবণ বলেন,—তোমার প্রভু চির হঠপ্রণয়ী কামুক বরুণ যথাস্থানেই অবস্থান করছেন। প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল কামনায় ক্লান্ত-হৃদয় রাজা গিয়েছেন সামান্য ক্লান্তি নাশ করতে। তবে শোন প্রহাস, তোমার প্রভুর স্বগৃহীত 'জলেশ্বর' উপাধি আজ হতে আমি হরণ করে নিলাম।

জলদেবীর কণ্ঠলীন দ্বীপমালিকার একটি একটি করে রত্ন হরণ করে নিয়ে বিজয়গর্বে দিগ্বিজয়ী বীর রাবণ ফিরছেন লঙ্কায়। কিন্তু, দৈত্যপুরের সেই অজ্ঞাত পরিচয় বান্ধবের নিধন সংবাদ অজ্ঞাত এক শঙ্কায় গভীরতর পঙ্কে তাঁকে নিমজ্জিত করে দিচ্ছে। অন্য কোন চিন্তাই তাঁকে সেই চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারছে না।

কে সেই মহামনা দানব যে আমারই কল্যাণ কামনায় গিয়েছিল দৈত্যপুরে আর আমারই অস্ত্রাঘাতে সে নাকি হয়েছে হত। অনিচ্ছাকৃত হলেও বড় মর্মান্তিক, বড় বেদনাদায়ক অপরাধ ঘটে গেল আমারই হাতে। নিদ্রায় কি জাগরণে একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত সেই বিষণ্ণ চিন্তা যেন অহর্নিশ আমাকে তাড়না করে চলেছে। একটা অজ্ঞাত অব্যক্ত আশঙ্কার যন্ত্রণা আমাকে বারে বারে চমকে দিচ্ছে। বুঝে উঠতে পারছি না, আজন্ম ভয় যার হৃদয় থেকে নির্বাসিত হয়েছে, ভয় যাকে দেখলে পলায়ন করে তার মনে শঙ্কা আর ভয় এত প্রশ্রয় পাচ্ছে কেন! মুহূর্তের জন্যও অপসৃত হচ্ছে না। আমার হৃদয়ের অগ্নিবীণায় শুধু বেহাগের সুর বাজে কেন! বরুণ-রাজ্য জয়ের মধ্যেও সেই বেদনাময় স্মৃতি বিস্মৃত হতে পারলাম না।—ভেবে ভেবে রাবণের খর-নয়নের দীপ্তি উদাস করুণ হয়ে গেছে। তীব্র অন্তর্যাতনায় অস্থির হয়ে পড়েছেন তিনি।—এ রহস্য যেন আমার জীবনে এক দৈব অভিশাপের কোপ। জানি না, এ সত্যই আমার জীবনে কোন অভিশাপের আঘাত কিনা। জীবনে এই প্রথম অসহ্য এক শঙ্কাতুরতার আবর্ত থেকে আমি যেন নিজেকে মুক্ত করতে পারছি না। আমার জীবনের সমস্ত সঙ্কল্প যেন এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে একটা বেদনা-শিহরিত রহস্য। বরুণ-নিকেতন পদানত করে 'রক্ষোমি'র মর্যাদামুকুট "জলেশ্বর" শিরে ধারণ করে লঙ্কায় ফিরে এলাম আমি। কিন্তু···

ঊষাভাসে রক্তিম হয়ে উঠেছে নীল সাগরের সলিল। রাবণের রণতরীর বহর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে। অশোক পলাশ রসাল বনবীথিঘেরা লঙ্কা দেখে বিজয়োল্লাসে চীৎকার করে ওঠে সেনাগণ। দীর্ঘদিন মাতৃদর্শনার্থীর নির্বাসিতের মত উৎসুক চঞ্চল

দৃষ্টিতে তারা দেখতে থাকে দেশজননীর সুন্দর রূপ। বড় মধুর, বড় সুন্দর সেই রূপ। যেন তৃষিতের অন্তরে সুশীতল বারি।

সন্তানের আনন্দ কোলাহলে সুপ্তা জননীর নিদ্রা ভেঙ্গে যায়। সন্তানে আপন বক্ষে বরণ করে নিতে যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন জননী।

কিন্তু রাবণের অন্তর শঙ্কিত শিশুর মত করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে। তাঁর অন্তরের বিষণ্ণ ছায়া যেন লঙ্কার আকাশে প্রতিবিম্বিত হয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।—এ তো প্রাবৃষা নয়, তবে হৈমন্তী লঙ্কার আকাশ এত মেঘাচ্ছন্ন কেন? এ কি চক্ষুর কোন ভ্রম! চক্ষু হস্তাবলিপ্ত করে পুনরায় তাকান। —না, সত্যই লঙ্কার আকাশ যেন এক ভয়াল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এ কি কোন ব্যথিত দৃষ্টির প্রহেলিকা! লঙ্কার একি কঠিন রূপ! সমস্ত রসাল কুঞ্জের ছায়া যেন অপসৃত হয়ে গেছে। অদ্ভুত একটা কাতর আকুলতার চিহ্ন ফুটে ওঠে তাঁর চোখে মুখে। একটা আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর অন্তর যেন ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।

ছান্দসী সাগরবক্ষের ছন্দ থেমে গেছে। বিজয়ী রক্ষোবীরগণ মাতৃমাটির স্পর্শ পেয়ে আনন্দ-স্পন্দিত মনে এগিয়ে চলতে থাকে। প্রিয়জনের কুশল দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তাদের অন্তর। কিন্তু রাবণ? ভয়ানক একটা শঙ্কাভারাক্রান্ত মনে ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ান স্বর্ণপুরীর সিংহ-দরজায়।

মন্দিরে মন্দিরে বেজে ওঠে কাঁসর-ঘণ্টা। শঙ্খধ্বনি করেন পূজারী। নৃত্যছন্দে নেচে ওঠে সারা লঙ্কা। পুরললনাগণ নানা মঙ্গল উপচার আর মঙ্গল দীপ হাতে লয়ে আনন্দ কলরবে এগিয়ে এসেছেন বিজয়ীকে বরণ করে নিতে।

উৎসবের আনন্দে প্রগল্‌ভা কৌতুকিনীর মত হাস্যময়ী হয়ে সকলেরই আগে এগিয়ে এসেছে শূর্পণখা। চঞ্চল বিলোচনা বার-সুন্দরীর মত ওষ্ঠসন্ধিতে কাহারও জন্য যেন এক মদহাস্য লুক্কায়িত রেখে, মনের সকল আবেগ ও আকুলতা কঠিন ধৈর্যে দমন করে রেখে,

দীর্ঘদিন প্রাণের পুরুষদর্শনহারা মদচঞ্চলা হরিণীর মত তড়িৎচঞ্চল আঁখি দিয়ে কাকে যেন অন্বেষণ করতে থাকে শূর্পণখা। জ্যেষ্ঠের অগ্রে বা পশ্চাতে, দক্ষিণে বা বামে অতি উৎসুক চঞ্চল দৃষ্টিতে তাঁকে অন্বেষণ করছে সে। কিন্তু দেখতে পায় না তাকে। হতাশার ছায়া নামে তার সুন্দর আননে। —কৈ, না, তাকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না! সেকি তবে জ্যেষ্ঠের সঙ্গী হয়ে আসে নি? কিন্তু সে যে বলেছিল, সে আসবে বিজয়গর্বে জ্যেষ্ঠের দক্ষিণ বাহুপাশে আলিঙ্গনা-বদ্ধ হয়ে! মহা আনন্দে বিজয়োৎসব করবে লঙ্কায় ফিরে এসে!—একটা অব্যক্ত শঙ্কায় তার হরিচন্দন-চর্চিত অধরদ্যুতি নিমেষে মিলিয়ে যায়।

সমস্ত লজ্জার বন্ধন ছিন্ন করে ব্যাকুলিতচিত্তে এক সময় জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করে,—কৈ, তাঁকে তো তুমি সঙ্গে নিয়ে এলে না জ্যেষ্ঠ? সে যে বলেছিল তোমারই সঙ্গে ফিরে এসে সে বিজয়োৎসব করবে লঙ্কায়! তোমারই জয়ের পথ সুগম করতে দুর্জয় দৈত্যরাজ্যে গিয়ে-ছিল মৈত্রীর বার্তা নিয়ে। তোমার সঙ্গে কি তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি? সে কি তবে কোন কারণে পশ্চাতে আসছে? তুমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন জ্যেষ্ঠ? কত দিন বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। তোমারই একান্ত স্নেহের পাত্র বিদ্যুজ্জিহ্বকে সাক্ষাতের পরও ফেলে রেখে আসতে পারলে তুমি?

অকস্মাৎ একটা ভয়াল অন্ধকার নেমে আসে রাবণের চক্ষুর সম্মুখে। মেরু শিরায় বয়ে যায় একটা শীতল স্রোত। শীতল হয়ে যায় প্রতি শোণিত বিন্দু। এক লহমায় লুপ্ত হয়ে যায় তাঁর অন্তরের সকল চেতনা। বজ্রাহত মৃতের মত তিনিও দাঁড়িয়ে থাকেন। একটা মর্মভেদী আর্তক্রন্দন আকুল হয়ে যেন চীৎকার করতে থাকে তাঁর হৃৎপিণ্ডে।

একটা ভয়াবহ আশঙ্কায় উন্মাদিনীর মত আর্তচীৎকারে বলতে থাকে শূর্পণখা—বল, বল জ্যেষ্ঠ, বিদ্যুৎজিহ্ব কোথায়? তাকে তুমি কি করেছ? বল, বল জ্যেষ্ঠ, উত্তর দাও। তুমি নির্বাক কেন?

মূক-বধিরের মত দাঁড়িয়ে কেন? বল, বল সে কোথায়?

একটা ঘূর্ণাবর্তের আঘাতে রাবণের কম্পমান দেহখানা নীরব নিষ্পন্দে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে ভূতলে। লুপ্ত হয় চেতনা।

ধীরে ধীরে সংজ্ঞা ফিরে আসে রাবণের। বুঝতে পারেন তিনি,—দৈত্যপুরীর সেই মহৎপ্রাণ বান্ধব আর কেহ নয়, আমারই স্নেহধন্য বিদ্যুৎজিহ্ব। শূর্পণখা-পতি বিদ্যুৎজিহ্ব।—নীরব অশ্রুতে সিক্ত হয়ে যায় রাবণের বক্ষাবরণ। ক্ষীণকণ্ঠে বারংবার বলতে থাকেন,—বিদ্যুৎজিহ্ব, বিদ্যুৎজিহ্ব, আমার হৃৎপিণ্ডের সমস্ত শোণিত মোক্ষণ করে নিয়ে গেছ তুমি। ভগ্নী শূর্পণখা, স্নেহের শূর্পণখা, আজন্ম দুঃখিনী শূর্পণখা, আমি তোমার কি সর্বনাশ করেছি, আজ মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করছি। কোন্ স্নেহ দিয়ে আমি তা আজ পূরণ করব। আমার বক্ষের পঞ্জরাস্থি দিয়ে যদি তা পূরণ হয় তবে তাই হোক। মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি স্নেহের আকর্ষণের কাছে ক্ষমতা পরাজিত। দণ্ডকের অধিশ্বরী হলেও শূর্পণখা তোমার এই ক্ষতির কিঞ্চিৎমাত্র লাঘব হবে না।

বিজয় পতাকা নয়, শোকস্তব্ধ নীরব লঙ্কার ঘরে ঘরে উড্ডীন হয় কৃষ্ণপতাকা।

* * *

দণ্ডকারণ্য। সুবিশাল ও সুবিস্তৃত। রহস্যময়ী দণ্ডকের অঙ্গে-অঙ্গে অরণ্যানী স্তব্ধ নীরব তাপসীকার মত ধ্যানমগ্না। কানন সমাকুল দণ্ডকের দিব্যসলিলা সরোবর ঋষি-মহর্ষি আর তাপসীকাগণ অবগাহনে ধন্য করেন। ফলমূলাহারী চীর-অজীনধারী ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি-মহর্ষিগণের সুপরিচ্ছন্ন আশ্রম প্রাঙ্গণ হতে নিয়ত হোম আর বেদমন্ত্র ধ্বনিত হয়ে দণ্ডকের আকাশ পবিত্রসুন্দর দিব্যগন্ধময় করে রাখে। প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে দণ্ডক তাঁর দেহ সুশোভিত করে রাখে স্ফূটকুসুম সজ্জায়।

এমনই এক শান্ত সমাহিত পরিবেশে জনস্থানে রাজপ্রাসাদের এক একান্ত কক্ষে তম্বুরা ক্রোড়ে করে আপনা-আপনি সঙ্গীত সাধনায় মুগ্ধ হয়ে থাকে শূর্পণখা। তার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা মূর্ত হয়ে ওঠে সঙ্গীতের সুরে ছন্দে। যেন এক অমর্ত্য মানবী জীবনের কোন আকাঙ্ক্ষিত ব্রতের উদ্‌যাপন করতে তপস্যাতন্ময়ে যন্ত্রে আর কণ্ঠে জয় করতে চায় বিশ্বপ্রকৃতির হৃদয়। সবলা নারীর হাতের অসি আজ যেন কোন এক আঘাতে রূপ নিয়েছে তম্বুরা আর কণ্ঠের প্রীতিতে। সঙ্গীতে সুরে তম্বুরা তন্ত্রীর ধ্বনিতে শূর্পণখা অনুভব করে প্রিয়জনের প্রেমালাপ, কোকিলের কুহুতান, ভ্রমরের গুঞ্জরণ।

তপস্বিনী নয় তবুও দেখে মনে হয় এক কঠোর তাপসীকার জীবন গ্রহণ করে ব্রতচারিণী হয়ে আছে শূর্পণখা। জনস্থানের অধিকর্ত্রী হয়েও আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে জনস্থানের জনসুখের জন্য আত্মোৎসর্গ করে লোকসেবাব্রতচারিণী হয়েছে শূর্পণখা। সেবা আর সঙ্গীতে আপন জীবনকে সে প্রসারিত করে দিয়েছে বহুতে। নিজের হৃদয়কে বিলিয়ে দেয় প্রজাপুঞ্জের সুখে-দুঃখে। মর্তের দীনতা হীনতা বেদনায় ব্যথাভিভূত হয়ে পড়ে তার কোমল হৃদয়।

রাত্রিশেষের অন্ধকারে শুকতারার আলোক যখন আকাশে জাগে, তখন স্বর্গত পতির একটা বিশেষ আগ্রহের কথা মনে পড়ে আর বাষ্পাসারে মেদুর হয়ে ওঠে তার নীলকজ্জলপ্রভ দুই নয়ন। ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ায় পুরী প্রাঙ্গনের ভ্রমর-জল্পিত অশোক তরুতলে। তাকিয়ে থাকে নিকুঞ্জ প্রান্তের শ্যামশোভার দিকে। হৃদয়ের চঞ্চলতায় ব্যাকুল হয়ে পুনরায় দ্রুত চলে যায় সঙ্গীত-কক্ষে সুরের লীলায় জীবন সঞ্চার করতে।

যখন নিজের জীবনের চারদিকে তাকিয়ে দেখে শূর্পণখা তখন দেখতে পায় স্বামীহীন সংসারে আজীবন একটা শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তার জীবন। দাঁড়িয়ে থাকতেও বুঝি হবে। প্রজা-শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের সন্তান-সুখ অনুভব করতে চায়। কিন্তু না—তা হয় না। এ একটা তত্ত্ব হতে পারে, কিন্তু সত্য নয়।

নারীর এ চাওয়া চিরন্তন। ব্যতিক্রমও সত্য নয়। এ শুধু হতে পারে ব্যর্থ জীবনের অভিমান। একটা কামনা নারীর অন্তরে নিরন্তর সুসুপ্ত পাবক শিখার মত জ্বলে।

আবার নিজেই নিজের কথা ভেবে হঠাৎ চম্‌কে ওঠে সে,—তবে এই প্রজাহিতব্রত, লোকসেবাব্রত, সমদর্শীতার নীতি এসব কি মিথ্যা? আত্মপ্রতারণা মাত্র? একি শুধু পুরুষেরই ধর্ম, পুরুষেরই ব্রত, পুরুষেই শোভা পায়? নারীর ধর্মনীতি কি শুধুই পতিসেবা, সন্তান-পালন আর আত্মসুখ?

আবার নিজেই উত্তর অন্বেষণ করে ভাবে, না, কিছুই মিথ্যা নয়। কিছুই একক সত্য নয়, একক সম্পূর্ণও নয়। সব মিলিয়েই পূর্ণতা।

আবার সুমন্দ্র সুরধ্বনিতে আত্মসমাহিত হয়ে যায় শূর্পণখা। তার চম্পক কোরক সদৃশ কোমল করাঙ্গুলিস্পর্শে সুমন্দ্রিত হয়ে ওঠে তম্বুরাধ্বনি।

এমনি ভাবে কালচক্রে আবর্তিত হয় দিন-মাস-বর্ষ। আসে যায় শীত-গ্রীষ্ম-প্রাবৃষা-বসন্ত। এমনি ভাবে চলে শূর্পণখার জীবন।

* * *

বুঝতে পারে নি রাবণ। কল্পনাও করতে পারে নি, স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মা দেবরাজের মুক্তির প্রস্তাব নিয়ে আসবেন তার কাছে। বিব্রত বোধ করেন। বিচলিতও হন। বুঝতে পারছেন না রাবণ, দীর্ঘ এই পথশ্রমকে স্বীকার করে কি স্বার্থে ভগবান ব্রহ্মা এসেছেন ইন্দ্রকে উদ্ধার করতে। দেবরাজ ইন্দ্র সম্বন্ধে তিনি কি কিছু অবগত নন? একথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। আমার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্বন্ধেও তো তিনি অবহিত আছেন। সে সকল অতীতের কথা যদি বিস্মৃতও হয়ে গিয়ে থাকেন, তবে আমার কার্যকলাপ দেখেও কি তিনি অনুমান করতে পারছেন না? আমি কি কোন অন্যায় কার্য করে চলেছি?

অথবা জনসম্পদ আমি আত্মভোগে নিয়োজিত করেছি? তবে কেন ভগবান ব্রহ্মা দেবগণের এই কূটনৈতিক গূঢ়যুদ্ধে নিজেকে সমর্পণ করলেন? আমার সন্ধিবিগ্রহাধিকরণ এই যুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। অথচ ভগবান ব্রহ্মার অনুরোধ উপেক্ষা করাও গুরুতর অন্যায়। শঙ্কটের এই আবর্তে আমার বিচারবুদ্ধি যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

উত্তর মেঘ চলে এসেছে দক্ষিণে, অমরাবতী থেকে লঙ্কায়। ত্রিভুবনের দৃষ্টি এখন লঙ্কায় নিবদ্ধ। দৃশ্যপট লঙ্কার প্রাসাদের অন্তর্মণ্ডলে।

চন্দনদারুময় স্বর্ণ সিংহাসনে বসে আছেন অতিবৃদ্ধ পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা। দক্ষিণে রাবণ আর বামে দেবর্ষি নারদ। মর্যাদানু-পাতিক আসনে বসে আছেন দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবপ্রতিনিধি-বৃন্দ। কোন আয়ুক্তপুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

কক্ষের সর্বত্র সুবিন্যস্ত পুষ্পধানী আর ত্রিপদী ফলকে ধূমবর্ত্তি করঙ্ক আর মধুভৃঙ্গার স্বর্ণচসক। সসম্ভ্রমে ও সমর্যাদায় আপ্যায়ন করে রাবণ বলেন,—ভগবন্! আপনার শুভ পদার্পণে আমার স্বর্ণলঙ্কা ধন্য হয়েছে।

সাগরবায়ুতে কক্ষের তিরস্করণী সচঞ্চলে আন্দোলিত হচ্ছে। ভগবান ব্রহ্মা তাঁর শুভ্র গুম্ফে অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে করতে ধীরে সুস্থিরে বলেন,—বৎস রাবণ, আমি তোমার রাজ্যে পদার্পণ করে সবিশেষ প্রীত হয়েছি। তোমার রাজ্যে সকল প্রজাপুঞ্জের মুখ হাস্যময় দেখতে পেয়ে আমার সৃষ্টি অন্ততঃ একটি রাজ্যেও সার্থক হয়েছে বলে আনন্দ বোধ করছি। তোমার রাজ্যে প্রজাবৃন্দ সকলেই স্বাস্থ্যবান এবং কর্মঠ। প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে এর চাইতে প্রীতিদায়ক আর কি হতে পারে।

—ভগবন্! আমার রাজ্যে কোন বন্দী নেই। কোন বন্দী-নিবাসও নেই। কোন নরকও নেই। পার্থিব সম্পদ সকল প্রজাপুঞ্জ প্রয়োজন মত ব্যবহারের অধিকার লাভ করে সুখী হোক, সে ব্যবস্থাই আমি লঙ্কারাজ্যে প্রবর্তন করেছি। ভগবন্, রাজ্য সুপরিচালনে

দশটি স্বশাসিত বিভাগে বিভক্ত করেছি।

—বৎস, ইহা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ ব্যবস্থা সন্দেহ নেই, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তোমার অধীনে বন্দী কেন ?

—ভগবন্, আপনি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই লঙ্কায় বিচরণ করছেন কিনা।

—বৎস, এ সত্য অবশ্যই তুমি উপলব্ধি করতে পারবে যে,পরাজিত ও বন্দী হয়ে পরদেশবাসের স্বাধীনতা পরাধীনতারই নামান্তর মাত্র। যে স্থানে জীবগণ জন্মগ্রহণ করে, বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করে, সে স্থানটির প্রতি তার আকর্ষণ স্বাভাবিক। সেইটিই হয় তার মাতৃভূমি—স্বদেশ। মাতার প্রতি সন্তানের আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক, মাতৃভূমির প্রতি আকর্ষণও তেমনি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক! রাজা বা বৈশ্যদেরও মাতৃভূমির প্রতি আকর্ষণ থাকে, তা যত পরোক্ষই হোক। আর যাদের তা থাকে না তারাই পাপিষ্ঠ। বৎস, ঋষি বিশ্রবার আশ্রম তোমার নিকট যত দুঃখময়ই হোক তথাপি তোমার হৃদয়ের গোপন কক্ষে তার জন্য একটা নম্রকক্ষ আছেই।

শুনে চমকে ওঠেন রাবণ। ভাবেন, একথা সম্পূর্ণ সত্য।

তাই বলি, তোমার রাজ্যে দেবরাজের স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নয়। তিনি স্বাধীন হবেন তুমি তাকে মুক্তি দিলে। স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তনের অধিকার দিলে।

স্মিতহাস্যে রাবণ বলেন,—ভগবন্, আপনার অভিপ্রায় পূর্বাহ্নেই জানতে পেরে আমি সে ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করে রেখেছি। দেবরাজ মুক্ত এবং তিনি এই মুহূর্তে তাঁর অমরাবতীতে স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারবেন।

বিস্ময় ও স্নেহের দৃষ্টিতে রাবণের দিকে তাকান ব্রহ্মা।—বৎস, তুমি মহৎ, তুমি উদার, তুমি একটি পরিপূর্ণ মানুষ। তোমার হৃদয় আছে, বোধ আছে, আছে বুদ্ধি।

সশ্রদ্ধ প্রশ্নাকুল দৃষ্টিতে ব্রহ্মার দিকে তাকিয়ে রাবণ বলেন, —ভগবন্, আপনি বিশ্বগুরু, আপনি প্রজাপতি, ত্রিভুবনের সকল

আপনার সুপরিজ্ঞাত। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়,—স্বর্গ-মর্ত-পাতালের তাবৎ রাজন্যকুল এমন কি দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত—যাঁর মুক্তিকামনায় আপনি এই বার্ধক্যেও দীর্ঘ পথশ্রম স্বীকার করে লঙ্কায় এসেছেন, তাঁদের শাসনাধীনে প্রজাপুঞ্জ কি মুক্ত ও স্বাধীন?

গম্ভীর হয়ে যান প্রজাপতি ব্রহ্মা। সগম্ভীরে উত্তর দেন,—না।

—তাঁদের সমাজ সংহিতা, রাজ্যশাসন সংহিতা কি তাঁদেরই স্বার্থে রচিত নয়?

—হ্যাঁ।

—আমার সমদর্শিতার নীতি, সর্বজনে সমসুখের বিধান রচনা, এ কি অন্যায়? দেবতাদের সংহিতায় বলে ব্রাহ্মণগণ আপনার মুখ থেকে নির্গত। সুতরাং তাঁরা সমাজে বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকারী। ক্ষত্রিয়গণ আপনার ভুজ থেকে উৎপন্ন, সুতরাং তাঁরা রাজ্যশাসনে আপনার প্রতিনিধি এবং বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকারী। বৈশ্যগণ বিশেষ সুবিধাভোগের দাবী করে। এই সুবিধাভোগ থেকে বঞ্চিত শুধু শূদ্রগণ। যারা সংখ্যায় অগণিত ও চির দরিদ্র। শুধু উচ্চশ্রেণীর সেবাব্রতের অধিকারী তারা। এ বিধান আপনারই ইচ্ছায় রচিত বলে প্রচার।

সহসা দপ্ করে জ্বলে ওঠেন ব্রহ্মা। ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠেন,—সব মিথ্যা। তারা ভণ্ড, তারা প্রতারক। আমার সরলতার সুযোগ গ্রহণ করে তারা আমাকে প্রতারিত করেছে। আমি মনুষ্য সৃষ্টি করেছি, আমি ভেদ সৃষ্টি করি নি। সকলের সমভোগের জন্য আমি বিশ্বপ্রকৃতি সৃষ্টি করেছি। আমার সমদৃষ্টিতে সৃষ্ট এই প্রকৃতি-সম্পদ যারা আমার নামে অপরকে প্রতারিত ও বঞ্চিত করে আত্ম-সুখভোগে ব্যবহার করে তারা মনুষ্যসমাজে তস্কর। তারা সমাজদস্যু। তারা কোন দিন মুক্ত হতে পারবে না। তারা হীন কামনার অধীন হয়ে চিরনরকভোগ করবে।—তারপর ক্রোধ সংবরণ করে ধীরে ধীরে শান্ত স্বরে বলেন,—বৎস রাবণ! তুমি বিচলিত হয়ো না, বঞ্চিতরাই একদিন এ অন্যায়ের প্রতিকার করবে। তুমি তার সোপান রচনা করে

যাও। তবে আমার সন্দেহ হয় এই দস্যুরা তোমাকে সে অবকাশ দেবে কিনা। যা হোক দেবরাজের মুক্তির জন্য তুমি কি পণ যাচ্ঞা কর? দেবতাগণ তা দিতে প্রস্তুত।

—ভগবন্, আপনার আশীর্বাদই আমার মহার্ঘ পণ। এতদধিক কোন পণই আমি যাচ্ঞা করি না। প্রজাশোষণ কলুষিত-দেবতাদের ঐ সম্পদ আমি স্পর্শ করতে ঘৃণা বোধ করি। আমি তাদের জয় করেছি কিন্তু সম্পদ কোন দিন স্পর্শ করি নি।

—০—

॥ ৯ ॥

অযোধ্যার অধিশ্বর নৃপতি দশরথ অভিলাষ করলেন, পুণ্য চৈত্রের আকাশে যখন পুষ্যার আবির্ভাব হবে, সেই শুভলগ্নে রামচন্দ্র হবেন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত।

আনন্দোৎসবে নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মুখরিত হয়ে ওঠে অযোধ্যার আকাশ। হাস্যে-লাস্যে নৃত্যে-গীতে অতিক্রান্ত হয় কত বিলাসিত সন্ধ্যা। কেউ কণ্ঠ হতে গন্ধপুষ্পের-মালিকা খুলে নিয়ে পরিয়ে দেয় মদায়িত দয়িত কণ্ঠে। আনন্দ বিতরণে ব্যস্ত হয় গীত-পটীয়সী গণিকার দল। আনন্দ চিত্তে তা উপভোগ করেন নৃপতি দশরথ। কিন্তু একটা শঙ্কার ছায়া যেন বিভীষিকার মত তাঁর চিন্তার আকাশে উদিত হয়, আবার মিলিয়ে যায়। সেই ভয়ের কারণটা ভুলতে চেষ্টা করেন তিনি। কখনো কখনো উৎসবানন্দে ডুবে গিয়ে ভুলেও যান। কিন্তু সেই শঙ্কার ছায়া একেবারে লীন হয়ে যায় না।

রূপাতিশালিনী সুলোচনা কৈকেয়ীর আঁখি যুগলে ফুটে ওঠে একটা কুটিল দৃষ্টি। ওষ্ঠসন্ধিতে দেখা দেয় ঈর্ষার হাসি।—না না, হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না। অযোধ্যার সিংহাসন কিছুতেই হতে পারে না কৌশল্যানন্দনের। অযোধ্যা হবে আমার নন্দন ভরতের।

ওষ্ঠসন্ধিতে অভিমানের মদহাস্য বিকশিত করে বলেন,—মহারাজ, আপনি ইক্ষ্বাকু বংশের কথার মর্যাদা রক্ষা করুন।

—অবশ্যই প্রিয়ে, তোমার অভিলাষ কোনদিন অপূর্ণ রাখি নি। এই আনন্দের দিনে আজও অপূর্ণ রাখব না।

—চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী, আপনি আমার দুষ্কর সেবায় তুষ্ট হয়ে দু'টি বর দানের অঙ্গিকারে আবদ্ধ ছিলেন।

—স্মরণ হয়েছে। কি তোমার প্রার্থনা?

—যৌবরাজ্যে ভরতের অভিষেক, আর রামচন্দ্রের চতুর্দশ বৎসর বনবাস।

সুনির্মল সুনীল আকাশ থেকে কে যেন সহসা এক ভয়ানক বজ্রের আঘাত হানল দশরথের শিরে। একটা মহা সর্বনাশের বার্তা যেন তাঁর হৃৎপিণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে উদ্যত হল। অর্ধলুপ্ত সংজ্ঞায় ভগ্ন বচনে অতি ক্লান্ত অনুনয়ের সুরে দশরথ বলেন,—কৈকেয়ী, তুমি আমার প্রাণপ্রিয়া, ভিন্ন কোন বর যাচ্ঞা করে আমাকে চতুর্দিকের এক মহা সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা কর। আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা কর।

—অন্য কোন বর আমি যাচ্ঞা করি না। আপনি প্রত্যাখ্যান করেন, উত্তম, তবে ত্রিভুবনে ইক্ষ্বাকু বংশের অপযশ ঘোষিত হোক।

একটা নিদারুণ অভিশম্পাৎ যেন বাসুকীর মত শত ফণা বিস্তার করে নিরন্তর দংশন করে চলেছে অযোধ্যাপতির দেহে ও মনে। অসহায় ক্রোধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তিনি কৈকেয়ীর দিকে। কৈকেয়ী দৃঢ়। অবিচল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন দশরথের প্রতিজ্ঞা পূরণের প্রতীক্ষায়। চীৎকার করে বলে ওঠেন দশরথ,—পাপীয়সী, কামরূপিণী ধ্বংস, যে ধ্বংসের বার্তা নিয়ে তুমি এসেছ তাই পূরণ করলাম। জেনে যাও পাপিষ্ঠা,—তোমার পুত্র ভরত হবে যুবরাজ। রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস।—বলতে বলতে সংজ্ঞা হারান দশরথ।

অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় অযোধ্যার সমস্ত উৎসব আনন্দ মুখরতা। নিভে যায় সমস্ত আনন্দ প্রদীপ। মুছে যায় পুরীললাটের সমস্ত পত্রলিখা। অশ্রুজলে ভেসে যায় অভিষেকের আয়োজন।

শুনা যায় লক্ষ্মণের ক্রুদ্ধকণ্ঠ,—আদেশ কর রাঘব, এই মুহূর্তে পাপাচারী পিতাকে বন্দী করে তোমার সিংহাসন সুনিশ্চিত করি। আমি অস্ত্র হাতে ভরতের আক্রমণ প্রতিহত করব। আমার এই ন্যায় কার্যে প্রচ্ছন্ন সমর্থন আছে দেবী কৌশল্যার।

—সৌমিত্রি, আমি পিতার আদেশ শিরোধার্য করে বনগমন স্থির করেছি। কোন ধৃষ্ট আচরণের প্রয়োজন নেই।

অযোধ্যাকে অশ্রুসাগরে ভাসিয়ে শ্রীরামচন্দ্র চলে গেলেন

বনবাসে। সঙ্গে সঙ্গী সীতা আর লক্ষ্মণ। বিষাদের কালিমায় অবসন্ন হয়ে পড়ে অযোধ্যা।

*　　*　　*

তমসার তীরে বনবাসের প্রথম রাত্রি। জীবনে এই প্রথম তীব্র বেদনার জ্বালা অনুভব করেন রাঘব।—তমসার তীরে তৃণশয্যায় শায়িত আমি এক দুঃখী। দশরথ কৈকেয়ী হয়ত সুখশয্যায় সুখে রাত্রি যাপন করছেন। আর জননী কৈশল্যা ভাসছেন অশ্রুজলে। কি বিচিত্র এই জগৎ। মনুষ্যহৃদয় হিংস্র হতেও হিংস্রতর। স্বার্থই বলবান। ত্রিভুবন, সুন্দরী স্বৈরিনীদের লালসা-শাসিত একটা জগৎ। এ জগতে স্নেহ-মায়া-মমতার স্থান নেই। সে জগতে মুগ্ধ পিতা নারীর রূপের কাছে আত্মসমর্পণ করে আমাকে নিক্ষেপ করলেন দুঃখের সাগরে। অবস্থাই মানুষকে নিয়ে যায় অভিজ্ঞতার অঙ্গনে। জানি না, আমার এই অবস্থা নিয়ে যাবে আমাকে কোন্ অভিজ্ঞতার অঙ্গনে। তবে, অবস্থায় আত্মসমর্পণ নয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসই হবে পৌরুষময় পুরুষের ধর্ম। পিতা-বিমাতা আমাকে যে অবস্থায় নিক্ষেপ করুন, আমি আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই আত্মনিয়োগ করব। ঈশ্বর রাজকার্য পরিচালনের সমস্যা থেকে মুক্তি দিয়ে মঙ্গলই করেছেন। জানি না মঙ্গলময়ের কি অভিপ্রায়।

দূর দক্ষিণ-গগন-বলয়ের দিকে দৃক্পাত করে শ্রীরামচন্দ্র যেন তাঁর সঙ্কল্পিত পরীক্ষার কথা ভাবেন। পিতা দশরথকেও তিনি বলেছেন তাঁর সঙ্কল্পিত বনবাসস্থানের কথা।

চলেছেন শ্রীরামচন্দ্র। শান্তিসলিলা তমসাকে প্রণাম করে চলেছেন তিনি। কোশল রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে অতিক্রম করলেন পুত-সলিলা বেদশ্রুতি, গোমতী, স্যন্দিক। কত দিবস-রজনী অতিক্রান্ত হয়ে যায়, অতিক্রান্ত হয়ে যায় মাস-ঋতু-বর্ষ। অতিক্রম করেন তিনি কত কত গ্রাম-প্রান্তর, কর্ষিত ভূমি, পুষ্পিত কাননরাজি, কত বনানী।

পূত সলিলা গঙ্গায় অবগাহন শান্তি নিয়ে যান মিত্র নিষাদরাজ গুহ'র রাজ্য শৃঙ্গবের পুরে। অবসাদ আছে, আছে ক্লান্তি, কিন্তু চলার ক্ষান্তি নেই।

নিষাদ রাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অতিক্রম করেন বৎস্য দেশ। নগর ও জনপদের বর্হিমণ্ডলে এসে তাঁরা যান মহর্ষি ভরদ্বাজের আতিথ্য গ্রহণ করে আশীর্বাদ গ্রহণ করতে। বনবাসে কাল যাপন উদ্দেশ্যে, মহর্ষি ভরদ্বাজের উপদেশে চলতে থাকেন চিত্রকূট পর্বত লক্ষ্য করে। পথে তিনি মহর্ষি বাল্মীকির চরণ বন্দনা করে আশীর্বাদ গ্রহণ করে যান।

গন্ধমাদন সদৃশ রমণীয় চিত্রকূট। চিত্রকূটের পাদধৌত করে কলকল্লোলে বয়ে চলেছে মাল্যবতী। মাল্যবতীর রমণীয় তটে পর্ণশালা নির্মাণ করলেন লক্ষ্মণ। দীর্ঘকাল বাসের জন্য যথাশাস্ত্র বাস্তু শান্তি করে রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন কুটীরে।

—০—

॥ ১০ ॥

একদিন চিত্রকূট-কুটির অঙ্গনে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণে কি যেন অনুভব করতে চেষ্টা করেন রামচন্দ্র। অতি উৎকণ্ঠায় লক্ষ্মণকে ডেকে বলেন,—সৌমিত্রি, একটা দারুণ কোলাহল শুনতে পাচ্ছি। দূরের আকাশ ধূলিজালে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। কারণ অনুসন্ধান কর। —চিন্তিত দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন রাম।

এক বিশাল শালবৃক্ষে আরোহণ করে তীক্ষ্ণ নিরীক্ষণের দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করতে করতে লক্ষ্মণ বলেন,—আর্য, একটা সৈন্যদল যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে।

রাম চিন্তিত হলেন। সৈন্যদল আরও নিকটবর্তী হল। সহসা চমকিত হয়ে নিম্নস্বরে লক্ষ্মণ বলে উঠলেন,—আর্য, আমাদের আশ্রমের অগ্নি নির্বাপিত করুন, দেবী সীতাকে কুটিরে আশ্রয় নিতে বলুন, আপনি ধনুর্বাণ ধারণ করুন। পতাকাদৃষ্টে অনুমান করছি আমাদের অযোধ্যার রাজবাহিনী। কৈকেয়ীপুত্র ভরত বোধ হয় নিষ্কণ্টক হবার জন্য আমাদের হত্যা করতে আসছে। আমি অবরোহণ করে অস্ত্রধারণ করছি। আমার হাতে অস্ত্র থাকতে ত্রিভুবনে এমন কেহ নেই যে রাঘবের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে। আমি আজ কৈকেয়ী সহ ভরতকে হত্যা করে অযোধ্যাকে কলুষমুক্ত করব।

—সৌমিত্রি, অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্ত প্রায়শই ভুল হয়। তুমি উত্তেজিত হয়ো না। যদি সত্যই অযোধ্যা থেকে ভরত দুর্গম পথ অতিক্রম করে এতদূরে এসে থাকে তবে তা অবশ্যই কোন শুভ ইঙ্গিত। ভরত এসে থাকলে তাকে সাদরে আপ্যায়ন করবে। ইহাতে যেন অন্যথা না হয়।

দূরে সহসা সৈন্যবাহিনীর গতি থেমে গেল। আর তারা অগ্রসর হচ্ছে না দেখে রাম-লক্ষ্মণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ দেখে চমকে উঠলেন রাম—বশিষ্ঠ, অমাত্য, পৌরজন, সান্ত্রীগণ, ব্রাহ্মণ ও

ঋষি-মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে জটাচীরধারী বিবর্ণ কৃষ্ণকায় ভরত পদব্রজে এগিয়ে আসছে কুটির লক্ষ্য করে। দেখে রামের হৃদয় অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

আজ চিত্রকূটে রামের নিঃসঙ্গ বনকুটির জনসমাগমে ভরে উঠল। কুলগুরু বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করে সকলে উপবেশন করলে ভরত নিবেদন করতে লাগলেন,—কুলগুরু বশিষ্ঠদেব, ঋষি-মহর্ষিগণ, মন্ত্রী, আমাত্য, শ্রেষ্ঠ পৌরগণ সভাস্থ সকলে আপনারা শুনুন,—আমি পিতৃরাজ্য চাই নি, মাতাকেও পরামর্শ দেই নি, পরম ধর্মজ্ঞ রামচন্দ্রের সংকল্পও জানতাম না। পিতৃদত্ত অযোধ্যার রাজ্যভার আমি, দশরথাত্মজ জ্যেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রে প্রত্যর্পণ করছি। আমি সবিনয়ে অমলিন চিত্তে জ্যেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে অনুরোধ করছি তিনি নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করুন। আমি তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় অনুগত থাকব।

উপস্থিত সকলে, সাধু-সাধু, বলে ভরতকে ধন্যবাদ দিয়ে বলতে লাগলেন,—হে অযোধ্যাপতি রাঘব, রাজা ভরতের এই উদার ভ্রাতৃ-প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে আমাদের সকলের মনোভঙ্গ করবেন না। ভরতের এই সাধু প্রস্তাবকে সমর্থন করতে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছি। আপনি অযোধ্যায় ফিরে চলুন রাজা দশরথের অবর্তমানে আপনি ভিন্ন কে আছে অযোধ্যার সিংহাসন অলঙ্কৃত করতে পারে।

ভরত—আর্য, বর্ষাকালে জলপ্রবাহে ভগ্নসেতুর ন্যায় এই রাজ্য আপনি ভিন্ন কে রক্ষা করবে? মহাবাহু, আপনি আমাদের ভর্তা, আমরা ভৃত্য। আমাদের আপনি শাসন করুন, তাতে মঙ্গল হবে, রাজ্যের সকলেই আনন্দিত হবে। আমি হীনবুদ্ধি, বয়সে কনিষ্ঠ। আপনি থাকতে আমি কি করে রাজ্যপালন করব? আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করে সকলকে তুষ্ট করুন।

রামচন্দ্র—ভরত তোমার কথা নিঃসন্দেহে নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথের পুত্রেরই উপযুক্ত। রাজা দশরথেরই নির্দেশে আমি বনবাসী হয়েছি। তুমি অযোধ্যার সিংহাসন লাভ করেছ। তোমার তা গ্রহণ করা উচিত। ভরত, তুমি স্বয়ং মানুষের রাজা হও, আর আমি বন্যমৃগদের

রাজাধিরাজ হই। তুমি আজ প্রফুল্লমনে পুরশ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় গিয়ে সুখ ভোগ কর, আর আমিও হৃষ্টচিত্তে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করি।

ভরত—রাঘব, পৃথিবীতে আপনার তুল্য কে আছে। দুঃখ আপনাকে ব্যথিত করে না, সুখ হৃষ্ট করে না। জীবন ও মৃত্যু, সৎ ও অসৎ আপনার কাছে সমান। মোহবশে পিতা যে অন্যায় করেছেন আপনি তার প্রতিকার করুন।

রাম—ভরত, আমার পিতা দশরথ যা আজ্ঞা করেছেন তা আমি মিথ্যা হতে দিতে পারি না। চন্দ্রের শোভা অপনীত হতে পারে, হিমালয় হিম ত্যাগ করতে পারে কিন্তু আমি পিতার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারব না।

নিরুপায়ের মত হতাশকণ্ঠে ভরত বলতে লাগলেন,—ঋষি-মহর্ষিগণ, পুরবাসী-জনপদবাসীগণ, মন্ত্রী, সেনাপতি আপনারা কেহই কিছু বলছেন না কেন? কুলগুরু বশিষ্ঠদেব, আপনিই বা কিছু বলছেন না কেন?

ভরতের সকাতর অনুনয়-বিনয়েও রামচন্দ্রের দৃঢ়তায় রাবণ-নিধনকামী কোন কোন ঋষি-মহর্ষির অন্তরে একটা হতাশার ছায়া নেমে এল। তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দেবর্ষি নারদের কথা ভাবতে লাগলেন।

ভরতের অনুনয়ে বিগলিত অন্তর ব্রাহ্মণোত্তম জবালী মুখ খুললেন,—রাঘব, অশিক্ষিত জনের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন নিরর্থক না হয়। এ জগতে কে কার বন্ধু, কে কার কাছ থেকে কিছু পায়? জীব একাকী জন্মায় একাকী মরে। ইহলোক-পরলোকের কথা চতুর লোকের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থে আছে। তাঁরা বলেন—যজ্ঞ কর, দান কর, তপস্যা কর, ত্যাগ কর ইত্যাদি। এর উদ্দেশ্য কেবল জনসাধারণকে বশীভূত করা। অতএব রাম তুমি মনে কর ইহলোক-পরলোক কিছু নেই, যা প্রত্যক্ষ তার জন্য উদ্‌যোগী হও, পরোক্ষে মোহযুক্ত হয়ো না। তুমি সর্বসম্মত সদ্‌যুক্তি অনুসারে ভরতের সমর্পিত রাজ্য গ্রহণ কর, ভোগ কর।

বশিষ্ঠ—রাম,জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের অভিষেক হয় না, এই তোমাদের ইক্ষাকুবংশের কুলধারা। তুমি এই কুলধর্ম নষ্ট করো না। আমি তোমার পিতা ও তোমার আচার্য, আমার কথা রাখলে তোমার সদ্‌গতি হবে।

মাণ্ডলিক ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বললেন,—রাজা ভরত রামকে যে অনুরোধ করেছেন তা সর্বৈব সমর্থনীয়। জবালী ও ঋষি ভরদ্বাজ যা বললেন, তাও অত্যন্ত ন্যায্য আর রামচন্দ্র যে পিতৃসত্য পালনের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন তাও ন্যায্য। এমতাবস্থায় আমরা কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করতে পারছি না।

ভরত—এমতাবস্থায় আমি রামচন্দ্রের বনবাসের প্রতিনিধিত্ব করব। শ্রীরামচন্দ্র আমার স্থলে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হোন।

রাবণ-নিধনকামী ঋষিগণ যেন 'প্রতিনিধিত্ব' শব্দে একটা সম্ভাব্য বিকল্প সূত্রের সন্ধান পেলেন,—উত্তম, রামচন্দ্রই অযোধ্যার অধিপতি থাকবেন, ভরত শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য শাসন করুন। আর রামচন্দ্র বনবাস কালে এক মহৎ কার্য সম্পাদন করবেন।

রামচন্দ্রের বদনমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি স্মিতহাস্যে বললেন,—সাধু প্রস্তাব। আমি ভরতকে জানি, সে ন্যায়বান, ক্ষমা-শীল, গুরুজনের মানরক্ষক! আমি বনবাস থেকে ফিরে গিয়ে রাজা হয়ে ভ্রাতার সঙ্গে পৃথিবী ভোগ করব। তাতে সর্বদিক রক্ষা হবে, অযোধ্যার সিংহাসনেরও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হবে।

ভরত—উত্তম। আর্য্য, আপনার হেমভূষিত পাদুকাদ্বয় আমাকে দিন, তারাই রাজ্যের যোগক্ষেম বিধান করবে। আমি জটাচীরধারী ফলমূলাশী হয়ে সমস্তরাজকার্য আপনার পাদুকাকে নিবেদন করে সম্পাদন করব। রাজসিংহাসনে আপনার স্থানে থাকবে রামের প্রতীক পাদুকা। আমি রামের প্রতিনিধি মাত্র হব।

সাধুবাদে সভাস্থল মুখরিত হয়ে উঠল। এক নিদারুণ পাষাণভার যেন অপসারিত হয়ে গেল সকলের বক্ষ হ'তে। আনন্দ-আন্দোলিত

নয়নে রাম তাকালেন সকলের দিকে। রাবণনিধনকামী ঋষিদের নয়নে দেখা দিল অপার আনন্দ।

বিদায়লগ্ন হল অশ্রুসিক্ত। সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে রামচন্দ্রের পাদুকায় রাজছত্রধারণ করে বিদায় নিলেন ভরত। চিত্রকূটে রামচন্দ্রের বনকুটির পুনরায় হয়ে গেল নীরব নিঃসঙ্গ।

অতি দুঃখভারাক্রান্ত বচনে রাম বলেন,—সৌমিত্রি, চিত্রকূট আর ভাল লাগছে না। নতুন করে আত্মীয় বিচ্ছেদ স্মৃতি আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করছে। আর, হয়-হস্তিরাদির মূত্রপুরিষে এ স্থানের জলবায়ুও দূষিত হয়ে গেছে। তা ছাড়া বনবাসীদের কাছে এ স্থান বিশেষত্ব লাভ করেছে।

লক্ষ্মণ—স্থানত্যাগ নিঃসন্দেহে বিধেয়, কিন্তু আমাদের গন্তব্য স্থানই বা কি হতে পারে?

রাম—আমার দুঃখ, সন্দেহ ও দুশ্চিন্তা যা ছিল তা এখন দূর হয়েছে। অযোধ্যার সিংহাসন সম্বন্ধে এখন আমার আর কোন চিন্তা নেই। আমি বনবাসী হলেও এখন আমি অযোধ্যার রাজা। এখন আমার বনবাসকালের পূর্ব সিদ্ধান্ত নিশ্চিন্তে কার্যকর করতে হবে।

—আর্য, কি ছিল আপনার সিদ্ধান্ত?

—দাক্ষিণাত্যে অযোধ্যার প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা। দাক্ষিণাত্যে এখনও কোথাও কোথাও গণ-প্রজাতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। তা বিনাশ করে অযোধ্যার সিংহাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

—রাঘব, আমাদের পথ ও পন্থা হবে কি?

—সৌমিত্রি, দাক্ষিণাত্যের চরিত্র সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ, আর্য মুনিঋষিরা হবেন আমার সহায়। আমরা বর্তমানে অত্রি মুনির আশ্রমের উদ্দেশ্যে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করব। দণ্ডকারণ্যের বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রতিপত্তিশালী আর্য মুনি-ঋষিদের আশ্রম আছে, আমরা তাঁদের সহায়তা গ্রহণ করে অগ্রসর হব।

—কিন্তু তাঁরা আমাদের সাহায্য করবেন কেন?

—লক্ষ্মণ, সেজন্য তোমার চিন্তা করতে হবে না। তা প্রায় পূর্ব-

নির্ধারিত। রাজনীতির সকল কথাই প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয়। আমার উপর বিশ্বাস ও আস্থা রেখে পূর্বের ন্যায় নির্দ্বিধায় অনুসরণ কর।

—মার্জনা করুন আর্য, আমি মোহবশে প্রশ্ন করছিলাম। আমি আপনার আদেশের অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে আছি।

রামচন্দ্রের স্থানত্যাগের সিদ্ধান্তে চিত্রকূট অঞ্চলবাসী দরিদ্র অসহায় ঋষি-ব্রাহ্মণগণ চিন্তিত হন। কিন্তু সাক্ষাতে তাঁদের মনোকথা ব্যক্ত করতে সাহসী হচ্ছেন না কেহ। অবশেষে সভয়ে কম্পিতদেহী এক অতিবৃদ্ধ জড়াগ্রস্থ কুলপতি এসে রামকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—তোমাদের বিধিব্যবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তোমরা স্থানত্যাগে উদ্যোগী হয়েছ।

রাম কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন,—আপনার সন্দেহ মিথ্যা নয়। আমরা এই স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে মনস্থ করেছি।

—তোমাদের ভরসায় আমরা যারা এ স্থানে বাস করছিলাম তারা সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। নিকটেই অশ্বমুনির আশ্রমে গিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করব বলে স্থির করেছি। কারণ, রাবণের কনিষ্ঠ খর নামে এক রাক্ষস জনস্থানবাসী তপস্বীদের উপর উৎপীড়ণ করছে। তোমার উপরও তার আক্রোশ আছে। সে আমাদের উপর অশুচী বস্তু নিক্ষেপ করে, যজ্ঞ-সামগ্রী বিনষ্ট করে, দুর্বল তপস্বীদের হত্যা করে। তোমরা চলে গেলে কে আমাদের রক্ষা করবে, তাই আমরাও স্থানত্যাগের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছি। আমরা তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। বিদায়ের পূর্বে বলি,—খর দুষ্ট ও অত্যাচারী; রাবণ ততোধিক দুষ্ট। আর্য-শাস্ত্র সে মানে না। আর্যরাজাদের সে সহ্য করতে পারে না।

—ব্রাহ্মণগণ, আমি অত্রিমুনির আশ্রমে একদিন বিশ্রাম করে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করব। আপনারা আমার সহায় হোন। কিছুদিন আপনারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আত্মরক্ষা করে চলুন, আমি শীঘ্রই আপনাদের

উৎপাত বিনাশ করে আর্যধর্ম রক্ষা করব। আমি ক্ষত্রিয় রাজা, আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমি সচেতন আছি।

এক বিচ্ছেদ-বেদনার বাষ্প অন্তরে বয়ে নিয়ে রামচন্দ্র চলে এলেন অত্রিমুনির আশ্রমে। চলার পথে লক্ষ্মণকে তিনি বললেন,—সৌমিত্রি, মুনি-ঋষি আর ব্রাহ্মণদের অভিযোগগুলি অনুধাবন করো, দেখবে আর্য-রাজাদের অধিকার এখনও সর্বত্র স্বীকৃত নয়। দেখবে রাক্ষস-নিষাদাদি অনার্যগণ আর্যদের উপর অত্যাচারে পরাঙ্মুখ নয়। তারা আমাদের চির বৈরী। তথাপি কখনও কখনও কার্যোদ্ধারের প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে মৈত্রীরও প্রয়োজন হবে।

—আর্য, রাজনৈতিক কূটচালে আমি অজ্ঞ। আমি শুধু আপনার আদেশ পালনে অভিজ্ঞ ও দৃঢ়।

—ভগবন অত্রিদেব! বনবাসী দাশরথি রামের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। দীনের প্রণাম গ্রহণ করুন বিদুষিণী দেবী অনসূয়া।—বলে অত্রিরআশ্রমে গিয়ে দাঁড়ালেন রামচন্দ্র।

—দীর্ঘায়ু হও। জয়ী হও ক্ষত্রিয় প্রধান দাশরথি রাম।

—ভগবন! জয়ী হতে আপনার সাহায্য প্রার্থী।

—তুমি নিশ্চিন্ত হও রাম। এই দণ্ডকারণ্যে বহু তপস্বীর বাস। সকলেই তোমাকে আশীর্বাদ করবেন, তোমার সহায় হবেন। সকলেই তোমার উদ্দেশ্য অবগত আছেন। বনবাস তোমার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়েছে। রাজকার্যের ব্যস্ততায় এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হ'ত কিনা সন্দেহ।

—ভগবন, পরবর্তী কর্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।

—রাঘব, এই দণ্ডকারণ্য এককালে ইক্ষ্বাকু বংশেরই অধিকারে ছিল। তোমাদেরই পূর্বপুরুষ রাজা দণ্ড ছিলেন এ রাজ্যের অধিপতি। সুতরাং এ রাজ্যে ইক্ষ্বাকু বংশের আধিপত্য তুমি পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর। সুতীক্ষ্ণ, শরভঙ্গাদি ঋষি-মহর্ষিগণ সকলেই তোমাকে গ্রহণ করবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন।

—পথ?

ভগবন অত্রি কিঞ্চিৎ চিন্তিতভাবে বললেন,—নিঃসন্দেহে পথ অতি দুর্গম ও শ্বাপদসঙ্কুল। অবশ্য তোমাদের ন্যায় বীরের কাছে তা অতি তুচ্ছ। পথিমধ্যে ব্রাহ্মী শ্রীর অধিষ্ঠানে এক তেজোময় স্থান দেখতে পাবে, সে স্থানে এক বিশাল অগ্নিহোত্র গৃহকে কেন্দ্র করে বহু তেজস্বী ঋষি-মুনিগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করছেন। যদিও স্থানটি আর্যবিরোধী, শাস্ত্রদ্বেষী দুষ্ট রাক্ষস বিরাধের অধীন, তথাপি ঋষি-ব্রাহ্মণগণ স্ববলে বলীয়ান হয়ে আছেন। তুমি তাঁদের সাথে মিলিত হবে এবং বিরাধকে বধ করে মুনি-ঋষিদের নিশ্চিন্ত ও স্বাধীন করবে, তোমার পথও নিষ্কণ্টক করবে।

* * *

"অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥"

পূর্বার্চিক ছন্দে গীত হচ্ছে বেদমন্ত্র। লক্ষ্মণকে সম্বোধন করে রাম বলেন—সৌমিত্রি, দেখে শুনে মনে হচ্ছে অত্রিমুনি কথিত সেই স্থানই এই স্থান. তেজস্বী ব্রহ্মজ্ঞ মুনিগণের বাস। বেদমন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে হোমাগ্নি শিখা। ঐ দেখ বিশাল অগ্নিহোত্র-গৃহ। ক্ষাত্র অহং বর্জন করে ধনু থেকে গুণ খুলে ফেল। বিনম্রভাবে অগ্রসর হও।

তাঁদের দেখে অতি আনন্দিত চিত্তে এগিয়ে এলেন মুনি-ঋষিগণ। সুসন্তোষ আপ্যায়নে তাঁরা প্রীত করলেন অতিথিদের।—রাম, আমরা তোমাদের আগমন বার্তা জ্ঞাত আছি। পথশ্রমে তোমরা ক্লান্ত। ফল-জল গ্রহণে তৃপ্ত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ কর। বহু কথা আছে, পশ্চাতে হবে।

আপ্যায়নে প্রীত হয়ে রাম বললেন,—প্রণম্য মুনিগণ! আমি ক্ষত্রিয় রাজা, কর্তব্য সম্পাদনের পূর্বে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম ক্ষাত্রধর্ম বিগর্হিত। আমার আরব্ধ কার্য সম্পাদনে আপনাদের সাহায্য প্রার্থী।

—রাজার উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ রাম। দেবর্ষি প্রমুখাৎ তোমার সকল কথাই আমরা জ্ঞাত আছি। আমাদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সহায়তার আশ্বাসে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার।

—আমার কাছ থেকে আপনারা কি আশা করেন ?

—বেদধর্মানুষ্ঠানের নিশ্চয়তা। রাম, তুমি লোকের ধর্মরক্ষক, শরণ্য, যশস্বী, পূজনীয়, মান্য, দণ্ডধর রাজা। রাজা, ইন্দ্রের চতুর্থাংশ স্বরূপ এবং প্রজা রক্ষা করেন। এ কারণে তিনি উত্তম উপভোগ্য বস্তুসকল ভোগ করেন এবং পূজিত হন। রাক্ষসগণ আর্যধর্মদ্বেষী। রাক্ষসরাজ রাবণ আমাদের পূজনীয় ইন্দ্রকে নির্জিত করেছে। তুমি তাকে নিধন করে আর্যধর্ম রক্ষা কর, আর্যরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠা কর। রাম, তুমি নগরে বা বনে যেখানেই থাক, তুমি আমাদের অধিপতি রাজা। আমরা তোমার অধিকারে বাস করছি, অতএব আমরা তোমার রক্ষণীয়। দুষ্ট রাক্ষস বিরাধ আমাদের যজ্ঞ পণ্ড করতে উদ্যত, তুমি তার নিধন ঘটিয়ে আমাদের রক্ষা কর।

—মাননীয়গণ আমি আপনাদের আজ্ঞা পালন করব। অতঃপর আমি ঋষি শরভঙ্গ ও সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে যেতে মনন করেছি। পথ নির্দেশ করুন।

—তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই রাম, পথ নির্দেশিকা প্রস্তুত। পথে সকলেই তোমার সহযোগীতার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। ঋষিগণও তোমার সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন। বনপথে তোমার শত্রু বিরাধ রাক্ষসের পুর আছে, তাকে তুমি নিধন করে অগ্রসর হবে। পশ্চাতে শত্রু রেখে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া বিধেয় নয়।

তাঁদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, সূর্য যেমন মেঘমণ্ডলে প্রবেশ করেন, সেইরূপ রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে নিবিড় অরণ্য প্রদেশে প্রবেশ করলেন।

অরণ্য দুর্গম, অতিদুর্গম। পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চলছেন তাঁরা। এই দুর্গম অরণ্য মধ্যে মাঝে মাঝে অতি মনোরম পুষ্পিত

কানন, স্বচ্ছসলিলা বিশাল সরোবর দেখে বিস্মিত হচ্ছেন তাঁরা। মাঝে মাঝে মুনি-ঋষিদের আশ্রমও দেখতে পাচ্ছেন। কেহ আপ্যায়ন করছেন, কেহ বা পথ-নির্দেশ করছেন। কেহ বা জিজ্ঞাসা করছেন তাঁদের কুশল সংবাদ।

দূরে প্রাকার বেষ্টিত এক অরণ্যপুরী দেখে বিস্মিত হন তাঁরা। রাম সবিস্ময়ে বলেন,—লক্ষ্মণ, এই দুর্গম অরণ্যে এমন সুরক্ষিত পুরী দেখা যায় না। মনে হয় এই বোধ হয় রাক্ষস প্রধান বিরাধের পুরী।

সহসা এক গম্ভীর কঠোর কণ্ঠ শুনে চমকে ওঠেন তাঁরা।—কে তোমরা জটাচীরধারী ক্ষীণজীবী মানুষ? তোমাদের বেশ তপস্বীর অথচ সশস্ত্র। এক রমণী সঙ্গে নিয়ে কোন পাপাচরণ করতে দণ্ডকে বিচরণ করছ? তোমরা নিতান্তই অপরিচিত। এ অঞ্চলের অধিবাসী বলে মনে হয় না। তোমরা কে, কোথায় যেতে চাও? আর কি উদ্দেশ্যেই বা তোমাদের দণ্ডকারণ্যে আগমন? এ স্থান আমার অধীন। মিত্র হলে অস্ত্র সংবরণ কর অন্যথায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও।

—আমরা ইক্ষাকু বংশীয় সচ্চরিত্র। এখন বনে এসেছি। তুমি কে?

—আমি যবের নন্দন। শতহ্রদা আমার জননী। আমি রাক্ষসাধিপতি বিরাধ। প্রজাপতি ব্রহ্মা আমার গুরু।

—আমি অযোধ্যাপতি দাশরথি রাম। দণ্ডকারণ্য ইক্ষাকু বংশের অধীন রাজ্য। দণ্ডকারণ্য আমার রাজ্যাধীন। শত্রুর সম্মুখে ক্ষত্রিয় বীরগণ কখনও অস্ত্রত্যাগ করে না। পাপিষ্ঠ বিরাধ তুমি শমন সদনে যাবার জন্য প্রস্তুত হও,—বলে রাম বিরাধকে লক্ষ্য করে সপ্তশর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু লৌহদেহী বিরাধের দেহে সেই শর শিশু নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের মতই হাস্যকর পরিণতি লাভ করল।

বিরাধ হেসে উঠে দারুণ ত্রিশূল আর কৃষ্ণসর্পের ন্যায় এক ভয়াবহ অস্ত্র নিয়ে রামলক্ষ্মণকে আক্রমণ করলেন।

রাম ভাবতে লাগলেন,—যত সহজ ও সামান্য মনে করা হয়েছিল এ শত্রু তত সহজ ও সামান্য নয়। অজ্ঞ, অরণ্যচারী হলেও যুদ্ধে যথেষ্ট পারদর্শী ও অস্ত্রবলে বলীয়ান।

দেখতে দেখতে বিরাধ বাহুবলে লক্ষ্মণকে আকর্ষণ করে নিল। এক সুযোগে লক্ষ্মণ খড়্গাঘাতে বিরাধের বাহু ছেদন করে দিলেন। আক্ষেপ করে বিরাধ বললে,—যুদ্ধে শত্রুকে তুচ্ছ মনে করা বিনাশের কারণ হল। আমার অসতর্কতার সুযোগ গ্রহণ করতে তুমি মূহুর্ত বিলম্ব করনি, সেই বিচারে তোমরা শ্রেষ্ঠ। বলতে বলতে বিরাধের ক্ষতবিক্ষত দেহ ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল।

সশঙ্কে রাম বললেন,—লক্ষ্মণ, রাক্ষসপ্রধান নিহত হয়েছে। এ স্থান আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নিরাপদ নয়। রাক্ষস প্রধানের যে রূপ দেখলাম, অন্যরা এর থেকে ন্যূন হলেও যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে। আর ক্ষণ-বিলম্ব না করে স্থান ত্যাগ করে গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া বিধেয়।

—সঙ্গত কথাই বলেছেন আর্য। তাতে আমরাও বোধ হয় শীঘ্র গন্তব্যস্থলের নিকটবর্তি হতে পারব।

বিরাধের মৃতদেহ ত্যাগ করে তাঁরা পদচিহ্ন অনুসরণ করে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু লতা-গুল্ম সমাচ্ছন্ন পথ পদেপদে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল।—লক্ষ্মণ, আমাদের অপরিচিত পথঘাট বড় দুর্গম। ঋষি শরভঙ্গের আশ্রম যে আর কতদূরে তা বুঝে উঠতে পারছি না।

লক্ষ্মণ—মুনিদের নির্দেশ দৃষ্টে তো মনে হয় সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছি। আর অধিক দূরে বলেও মনে হয় না। নিকটে কোন নিষাদ পল্লী দেখতে পাচ্ছি না, তাই মনে হয় আমরা শত্রুঅঞ্চল অতিক্রম করে এসেছি।

রামচন্দ্র—সমস্ত দণ্ডকারণ্যই আমাদের শত্রুঅঞ্চল মনে করতে পার। শুধু দণ্ডকারণ্য কেন সমস্ত দক্ষিণাবর্ত্ত'ই। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্বিরোধকে অবলম্বন করে মিত্রের সন্ধান করে নিতে হবে।

কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রায় শরভঙ্গমুনির আশ্রমাঞ্চলের নিকটবর্তি হয়ে এসেছেন। তাঁদের দেখে পল্লীবাসীগণ ভাবতে লাগলেন,—ইনিই অবশ্য রামচন্দ্র। রামচন্দ্র বনবাসী রাজা। পূর্বে

যিনি পাত্র-মিত্র সহ দিব্যরথে আরোহণ করে গেছেন তিনি অন্য কোন রাজা। শরভঙ্গ মুনির আশ্রম আজ ধন্য হতে চলেছে।

ইতিপূর্বে দিব্যরথে আরোহণ করে এইপথে গিয়েছেন দেবরাজ ইন্দ্র। দেবরাজ এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন শরভঙ্গের আশ্রমে। একান্ত গোপনীয় সেই উদ্দেশ্য। উভয়ের মধ্যে গভীর ও দীর্ঘ আলোচনার পর বিদায়ের জন্য দেবরাজ এসে রথে আরোহণ করলেন।

দূর থেকে রামচন্দ্র সেই রথ দেখতে পেয়ে লক্ষ্মণকে বললেন,—সৌমিত্রি, ইতিপূর্বে যে সকল বর্ণনা শুনেছি তাতে মনে হয় এই রথ দেবরাজ ইন্দ্রের। নিশ্চয়ই এই আশ্রমই হবে ঋষি শরভঙ্গের। চল, আমরা দ্রুত অগ্রসর হয়ে দেবরাজের সঙ্গে সাক্ষাতালাপ করি।

রামচন্দ্র আসছেন দেখতে পেয়ে ইন্দ্র তাঁর সঙ্গীগণকে বললেন,—আর বিলম্ব নয়, রামচন্দ্র আসছেন। তাঁর আসার পূর্বেই আমি এ স্থান ত্যাগ করব।

—কারণ?—সঙ্গী দেবতাগণ জিজ্ঞাসা করলেন।

—রামচন্দ্র যে উদ্দেশ্যে যে পথে চলেছেন, আমারও সেই পথ। সেই উদ্দেশ্য সাধনে তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁকে দুষ্কর কর্ম করতে হবে। যখন তিনি কৃতকার্য ও জয়ী হবেন তখন আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।—বলে শরভঙ্গকে অভিবাদন করে চক্ষুর ইঙ্গিতে আলোচনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পলকাবকাশে অদৃশ্য হয়ে গেলেন দেবরাজ ইন্দ্র।

রাম সবিস্ময়ে দেখলেন ইন্দ্রের দিব্যরথ অন্তর্হিত হয়ে গেছে। নিকটে গিয়ে অগ্নিহোত্র শরভঙ্গের পাদবন্দনা করে রাম জিজ্ঞাসা করলেন,—ভগবন! আপনার আশ্রমে এক দিব্যরথ দেখেছিলাম, অনুমান করছি, দেবরাজ ইন্দ্র এসেছিলেন। প্রভু, কি কারণে দেবরাজের শুভাগমন হয়েছিল?

—রাম, আমি উগ্র তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মলোক অধিকার করেছি। ইন্দ্র আমাকে সে স্থানে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। তুমি এখানে আসবে তা তিনি জানতেন না।

—আপনি ব্রহ্মলোকে গেলেন না?

—রাম, আমি তপোবলে বহুলোক জয় করেছি, তোমার ন্যায় মহান রাজার হস্তে সে সকল সমর্পণ করে আমি ব্রহ্মলোকে যাব। সেই জন্য তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করছিলাম। নরশ্রেষ্ঠ, তোমার নিকট ঋষিদের কিছু নিবেদন আছে, তা বৈখানশ'রা বলবেন, আর আমার নির্দেশ হল, তুমি সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম হয়ে মহর্ষি অগস্ত্যের কাছে যাবে। সেখান থেকেই সমস্ত সাহায্য ও নির্দেশ লাভ করবে। আমার তপোলব্ধ শক্তি সমূহের অধিকারী হয়ে আমাকে ব্রহ্মলোকে প্রস্থানের জন্য মুক্ত কর।—বলে, ঋষি শরভঙ্গ তাঁর সমস্ত শক্তি ও সম্পদ রামের হস্তে সমর্পণ করে ব্রহ্মলোকের উদ্দেশ্যে বিদায় নিলেন।

ঋষি বৈখানস-বালখিল্য-সংপ্রক্ষাল অতীব দুঃখীত অন্তরে রামকে বলতে লাগলেন,—নরশ্রেষ্ঠ রাম, তোমার হস্তে আমাদের সমস্ত বল ও সম্পদ সমর্পন করবেন বলে ঋষি শরভঙ্গ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। আজ শরভঙ্গ মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। আমাদের নিবেদন শোন,—ইক্ষ্বাকু কুলতিলক রাম, তুমি পৃথিবীর রক্ষক, তোমার যশ ও বিক্রম ত্রিলোকে খ্যাত। তুমি আর্যধর্মের রক্ষক, আর্যরাজার মান বর্দ্ধক। এই দণ্ডকারণ্য তোমার। এই অরণ্যে বহু বাণপ্রস্থ ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁরা রাক্ষস হস্তে নিয়ত নিহত হচ্ছেন। তুমি তাঁদের মৃতদেহ দেখতে পাবে। দণ্ডকারণ্যের সর্বত্র তাঁরা অত্যন্ত উৎপীড়ন করছে। আমরা আর সইতে পারছি না। তুমি আমাদের রাজা হয়ে এ অন্যায়ের প্রতিবিধান না করলে আমরা কি উপায়ে ধর্মানুষ্ঠান করব? রাক্ষস, নিষাদাদি অনার্যদের প্রেরণা লঙ্কার রাজা পাপিষ্ঠ রাবণ। সে আর্যধর্মকে বিকৃত করতে রাজশাসনকে ব্যঙ্গ করে এক বিচিত্র প্রজাতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে উদ্যত হয়েছে। তুমি এর প্রতিকার না করলে ত্রিভুবন থেকে তুমি আমি সকলেই বিনষ্ট হব।

—আমি আপনাদের আজ্ঞাধীন। আমি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসী হলেও, আমি ক্ষত্রিয় রাজা। অনার্যদের সর্বপ্রকার উপদ্রবের

প্রতিকার অবশ্যই করব। তাতেই আমার বনবাস সার্থক হবে। আপনারা নিশ্চিত জানবেন, অযোধ্যার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিকামী রাম, দুর্বিনীত রাক্ষসাধিপতি রাবণের গণ-কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়েই ক্ষান্ত হবে।—বলে রামচন্দ্র ঋষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করলেন। এ পথ দীর্ঘও নয়, দুর্গমও নয়, সরল।

রামচন্দ্রের চিত্রকূট অবস্থানের কাল থেকেই দণ্ডকবাসী ঋষি-মহর্ষিগণ সাগ্রহে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন। দিন-মাস-বর্ষ অতিক্রান্ত হয় আর তাঁদের অধীরতাও যেন ক্রমেই ধৈর্য্যের সীমান্তে এসে পৌঁছতে থাকে। ঋষি সুতীক্ষ্ণও তাঁর শক্তি ও দানপত্র হাতে নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত অধীরতায় অগ্রসর হতে উদ্যত হয়েছিলেন, এমন সময় রামচন্দ্রের আগমন লক্ষ্য করে উচ্ছ্বাসানন্দে অগ্রসর হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন,—রঘুশ্রেষ্ঠ তোমার আগমনে আমার আশ্রম আজ সনাথ হল। তোমার চিত্রকূটে বসবাসকাল থেকেই আমি সব জানতে পেরে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম। আমি পুণ্যবলে সর্বলোক জয় করেছি। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও এসেছিলেন। তুমি আমার শক্তি ও সম্পদ গ্রহণ করে আমাকে দেবলোকে যাবার অনুমতি দাও।

—ভগবন! আমি আপনাদের আশীর্বাদ নিয়েই দণ্ডক রাক্ষসমুক্ত করতে চাই।

—উত্তম প্রস্তাব রঘুশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার আশ্রমকে কেন্দ্র করে দণ্ডক পরিক্রমা কর, দণ্ডকের সাথে পরিচিত হও। তোমার লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে ইহা অপরিহার্য্য।

—ভগবন! আপনার আশ্রয়ে আমি দণ্ডক পরিক্রমার সুযোগ লাভ করে প্রীতি বোধ করছি।

—রঘুশ্রেষ্ঠ, আমরা তোমার অধীন, আশ্রিত। তুমি আমাদের রাজা। দণ্ডকবনের সমস্ত মুনি-ঋষিগণই তোমাকে সাদরে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। তুমি যথেচ্ছা, যতকাল ইচ্ছা বাস ও পরিক্রমা করতে পার।

ঋষি সুতীক্ষ্ণের পরামর্শ অনুসারে দণ্ডক পরিক্রমা সুরু করলেন রাম। আশ্রমে আশ্রমে পরিভ্রমণ করে স্বীয় উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে থাকেন।

সীতার চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে একদিন তিনি প্রশ্ন করেন,—বৈদেহী, তোমাকে চিন্তান্বিত দেখছি কেন?

—প্রভু, অভয় দান করেন তবে বলতে পারি।

—নির্দ্বিধায় বলতে পার।

মনোহর স্নিগ্ধবাক্যে সীতা বলতে লাগলেন,—আর্য, আপনার রাক্ষসদের সাথে বিরোধের উদ্যোগ আয়োজনে আমি চিন্তিত ও শঙ্কিত। আপনি বনবাসী, তপস্বীর ধর্মই আপনার ধর্ম হওয়া উচিত। অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে ক্ষাত্রধর্মের চর্চা করতে পারেন। সৌম্য, এই তপোবনে শুদ্ধ স্বভাব হয়ে নিত্য ধর্মাচরণ করাই আপনার কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

—বৈদেহী, তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, যা বলেছ তার জন্য আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। কিন্তু, অনুরোধ করছি, তুমি আমার শুধু পত্নীই নও, সহধর্মচারিণীও হও। আমি ক্ষত্রিয়। তোমাকে ও লক্ষ্মণকেও ত্যাগ করতে পারি কিন্তু ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। রাজনীতি তোমার বিষয় নয়, তুমি উপদেশ দানে বিরত থাক।

সীতা সশঙ্কে নীরব হয়ে গেলেন।

পরিক্রমা সমাপ্ত করে রামচন্দ্র ঋষি সুতীক্ষ্ণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে গেলেন।

মহর্ষি অগস্ত্য শিষ্য পরিবৃত হয়ে রামচন্দ্রকে সম্বর্দ্ধনা করতে এলেন। কৃতাঞ্জলি হয়ে অতি বিনয় বচনে রাম বললেন,—ভগবন! প্রনাম গ্রহণ করুন। অমি আপনার কৃপাশ্রিত, সাহায্য প্রার্থী। আশীর্বাদ করে কৃতার্থ করুন।

—কাকুৎস্থ, অমি তোমাদের আশীর্বাদ করবার জন্যই উত্তরাপথ থেকে দক্ষিণাপথে এসে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতীক্ষা করছি। বিশ্বকর্মা নির্মিত এই স্বর্ণ হীরকভূষিত দিব্যবৈষ্ণব ধনু, ব্রহ্মদণ্ড নামক এই

সূর্যসংকাশ অমোঘশর, অক্ষয় শরপূর্ণ এই তূণীর, স্বর্ণকোষ ইন্দ্রদত্ত এই অসির সাহায্যে তুমি যুদ্ধে জয়ী হও।

—ভগবন! দেবরাজ ইন্দ্র কি এসেছিলেন?

—অবশ্যই। তোমার পথই দেবরাজের পথ ইহা নিশ্চিত জেনো। তোমার ন্যায় তিনিও মনে করেন গণ-প্রজাতন্ত্রের পূজারী রাবণই বর্তমান ত্রিভুবনে কঠিনতম বিপদ। সর্বসাধারণের সুখার্থে তাঁর স্বর্গের সরণী রচনার ভাবধারাই সমূহ বিপদের কারণ। তাঁর এই ভাবধারা অঙ্কুরেই বিনাশ না করতে পারলে অচিরেই তা এক মহা মহীরুহে পরিণত হয়ে আর্য-ধর্ম, আর্য ক্ষাত্রধর্ম চিরতরে বিলুপ্ত করে দেবে। এই দুষ্কর কার্যে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সকলেই রাবণের কাছে ব্যর্থ হয়েছে। তুমিই এই দুস্কর কার্য সাধনে যোগ্যতম ব্যক্তি।

—ভগবন! আমার বর্তমান অবস্থান কোথায় হবে?

—তোমরা সকলেই পরিশ্রান্ত। বিশ্রাম গ্রহণ কর। অদূরে পঞ্চবটী তোমার জন্য নির্দিষ্ট স্থান। সর্ব বিষয়ে অতি উত্তম স্থান। তোমার এই মহৎ কার্য সাধনে ত্রিভুবনের সমস্ত দেবতা, ঋষি-মহর্ষি সকলেই তোমার সহায় হবেন। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম কর। জানকীরও বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন। দীর্ঘ দিন যাবৎ দীর্ঘ পথশ্রম, ও কৃচ্ছ্রতা তোমাদের সকলকেই ক্লান্ত করেছে।

* * *

জনস্থানের শান্তি কলোচ্ছলা স্রোতস্বতী গোদাবরী শুধু শূর্পণখার অশ্রু আর দীর্ঘশ্বাস নয়, কত যুগ ধরে কত বিরহিনীর অশ্রু আর দীর্ঘশ্বাস বয়ে নিয়ে চলেছে কে জানে। পূতসলিলা ধর্ম দায়িনীর কটিতটদেশ আবৃত হয়ে আছে পঞ্চবটীর পুষ্পিত তরুলতায়। পুন্নাগ-পনস-চন্দন-চম্পক কাননের দিকে তাকালে জীবনের সকল তৃষ্ণা যেন মিটে যায়। দিকে দিকে শাল-তমাল-শাল্মলীর কান্তিমান সমারোহ। প্রকৃতিদেবী যেন তাঁর সমস্ত বিচিত্র বর্ণরাগচ্ছটা উৎসারিত করে দিয়েছে পঞ্চবটির বন বিথীকায়।

দূরে দেখা যায় বনান্তরালে শৈল কন্দরে ভীরু বলাকার মত আত্ম-গোপন করে দাঁড়িয়ে আছে শঙ্খধবল পাষাণে রচিত জনস্থানের অধিশ্বরী শূর্পণখার প্রাসাদ। যিনি আপন হৃদয়ের প্রসারতা দিয়ে রচনা করেছেন ত্রিভুবনে একটি বিরল সাম্রাজ্য। যাঁর করুণা-স্পর্শে দুঃখী প্রজাপুঞ্জ মনে করে শূর্পণখা মর্তের মানবী নয়, ঈশ্বরের দূতী। কিন্তু তাঁরাও কখনও কখনও ঐ করুণাময়ীর হাতে, দুষ্ট দমনে বীরাঙ্গনার মত শাণিত অসি দেখে ভীত ও বিস্মিত না হয়ে পারে না।

সমদৃষ্টির সাধিকা করুণাময়ী শূর্পণখা তাঁর পতিহীনা জীবনের ব্যর্থতার কাছে আত্মসমর্পন করেনি। সে বিশ্বাস করতে শিখেছে আত্মভোগ-সুখই জীবনের একমাত্র স্বার্থকতা নয়। বহুজনের সেবা-ব্রতের ভেতর দিয়েও জীবনকে স্বার্থকতা-মণ্ডিত করে তোলা যায়। দুঃখী জনের দুঃখ মোচনের ভেতর দিয়েও জীবনের পূর্ণতা লাভ করা যায়। তাই লোকহিত ব্রতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে শূর্পণখা।

শূর্পণখা আর জনস্থানের সকল সংবাদই রাখেন রাবণ। স্নেহ-লালিত ভগ্নীর জন্য তাঁর অন্তরের কোমল স্নেহের কক্ষে বড় বেদনা অনুভব করেন। ভাবেন,—আজন্ম পিতৃস্নেহবঞ্চিত দুর্ভাগিনীর ললাটে আমি যে কী নিদারুণ অভিশাপের আঘাত হেনেছি তা আজও মর্মে মর্মে অনুভব করছি। আজ আর তাঁর কোন সুখেই রুচি নেই। সে যেন আমার উপর এক দূরন্ত অভিমানের নিগ্রহ বরণ করে নিয়েছে। মাতামহ যথার্থই বলেছিলেন শূর্পনখার বীণাতন্ত্রীতে কোমল করাঙ্গুলী স্পর্শ আর রণলীলাময়ীরূপে অসি সঞ্চালন এ দুই যেন মূর্ত অভিমান। ভেবে আজ বড় দুঃখ হয় যে, জীবন পূর্ণতার কোন প্রস্তাবই সে গ্রহণ করেনি।

সেই অসাধারণী, সেই অমর্ত্যের নারী সমস্ত রাজকীয় মর্যাদার অহংকার আর বাহুল্য বর্জন করে বিচরণ করে জনস্থানে নিঃশঙ্কে নির্ভয়ে।

কেন, কেউ জানেনা জনস্থানের অধিশ্বরী শূর্পণখা বৎসরান্তের বিশেষ একটি দিনে পঞ্চবটি প্রান্তের গোদাবরীতে অবগাহন করে

একাকিনী নির্জনে নিরম্বু উপবাসে কাটান পঞ্চবটি বনে। আর সেই একটি মাত্র দিনে হর্ষ ও আনন্দে উদ্ভাসিত করে রাখতে চান নিজেকে। আপন মনে পুষ্পচয়ন করেন, মালা গাঁথেন, এবং সযত্নে কিংশুক শাখায় অর্পন করেন সেই মালিকা।

সে দিনও তিনি সেই অদ্ভুত ব্রত পালন করতে যান পঞ্চবটী বনে। গোদাবরীর পুত-সলিলে অবগাহন শান্তি নিয়ে কিছুক্ষণ তাঁকিয়ে থাকেন তট-রেখার দিকে। তারপর অদ্ভুত এক হর্ষ আর আনন্দে আপ্লুত হয়ে চয়ন করতে থাকেন বনপুষ্প। কাননভূমির অভ্যন্তরে হৃষ্টচিত্তে পরিভ্রমন করতে থকেন। একা একা চলতে চলতে হঠাৎ দেখে চমকে ওঠেন। বিস্ময়ের চমক যেন ভাঙ্গতে চায়না। জীবনে স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করতে পারেননি, নবীন কিংসুকের মত দুই অতি রূপবান আর্য যুবাপুরুষের এই ভাবে এই নির্জন বনপ্রান্তে সাক্ষাৎ লাভ করবেন। তাঁর জীবনের সমস্ত ব্রতের সঙ্কল্প, সমস্ত অভিমানের দূর্গ যেন ভেঙ্গে যেতে চায়। যেন ঐ সুন্দর শক্তিমান দের কাছে প্রপন্নের আবেদনের ব্রত নিয়ে এগিয়ে যেতে চায় মন। কিন্তু সঙ্গিনী ঐ রূপতিশালিনী নারী যেন লজ্জাকণ্টকের মত বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঐ পর্ণকুটির বাসী যুবাদের কাছে প্রণয়াভিলাসিনী নায়িকার মত কি আবেদন করতে পারে সে ? সে যে হবে বড় দীনতা। তথাপি একটা অদ্ভুত ইচ্ছার আবেগ সম্বরণ করতে পারেনা শূর্পণখা। অদ্ভুত একটা আনন্দে শিহরিত হয়ে ওঠে তার সর্বাঙ্গ। লজ্জাভার-মন্থর বন-হরিনীর মত ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় সে। সবিনয় মধুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে,—আর্য কুমারগণ, দেখে মনে হয় আপনারা রাজকুলোদ্ভব, কিন্তু কেন এবং কোন দুঃখে বনচারী হয়ে এক কঠিণ দুঃখের ব্রত উদ্‌যাপন করতে চলেছেন ? এ কঠিন কঠোর ধরণীতল অপনাদের বাসের স্থান হতে পারেনা। আপনারা আমার মহান অতিথি। দয়া করে আমার গৃহে এসে এই অধমাকে ধন্য করুন। নানাবর্ণের আলোকে আলোকিত করব প্রাসাদ। কণকে, রতনে, চম্পক-চামেলী পুষ্পে রচনা করে দেব আপনাদের শয্যা।

নিদারুণ এক বিস্ময় ফুটে ওঠে রামচন্দ্রের নয়নে,—এ যেন কোন সদ্য স্নাতা জল-নলিনী, সম্মুখের ঐ পদ্ম সরোবর থেকে কেলিক্রীড়া মত্ত হংস কারণ্ডবের সঙ্গ ত্যাগ করে উঠে এসেছে এই কুটির অঙ্গনে। অথবা, এ যেন কোন বনদেবী, পঞ্চবটীর সমস্ত বন শোভা ম্লান করে দিয়ে বনজ্যোৎস্নায় উদ্‌ভাসিত হয়ে কুটির অঙ্গন আলোকিত করে এসে দাঁড়িয়েছে। কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে মধুপ গুঞ্জন ধ্বনি।—অপলক মুগ্ধ নয়নে তাঁকিয়ে থাকেন রামচন্দ্র। তারপর সুমধুর বচনে জিজ্ঞাসা করেন,—কে তুমি বনদেবী একাকিনী নির্ভয়ে এই বিজন কাননে ভ্রমণ করছ? কেনই বা এবং কোন দুঃখে তুমিই বা গৃহত্যাগ করে দুঃখের ব্রত উদ্‌যাপন করতে এসেছ বনে?

—ভগবন। আমি শূর্পণখা, জনস্থানের অধীশ্বরী।—সুরবালিকার কোমল করাঙ্গুলি-ঘাতে সংগীত ঝংকারের মত কেঁদে ওঠে শূর্পণখার বেদনা-পীড়িত মৌনস্তব্ধতা।—আমার শূন্য জীবনে আপনি অধীশ্বর হয়ে জনস্থানের অধীশ্বর হয়ে সুখে বাস করুন। আমার জীবনের বিফল কাকলী উদাসিনী প্রতিধ্বনির মত ঘুরে ফিরছে বনান্তরে। আপনার পৌরুষ-শান্তিবারি সিঞ্চনে তাকে শান্ত করুন।

—শোভনে! আমি রঘুবীর রামচন্দ্র, অযোধ্যার অধীশ্বর। পিতৃসত্য পালন করতে বনবাসী হয়ে অযোধ্যার অধীন দণ্ডক পরিভ্রমণ করছি। সুযৌবনে, গৃহবাস আমার অবিধেয়। সুখবাস অনুচিত।

—আপনার অভিপ্রায় হলে আমি আপনার সহবনচারিনী হয়ে সেবা করব।

—আমার প্রিয় পত্নী বৈদেহী আমার সঙ্গিনী, প্রয়োজন কি দ্বিতীয়া নারীর।

—আমার প্রয়োজন আছে। বৈদেহীকে জ্যৈষ্ঠার ন্যায় সেবায় আমি পরিতুষ্ট করব।

—বরাননে! অনুজ লক্ষণে তুমি নিবেদন কর তোমার অন্তরের কামনা।

যেন ক্লান্ত জীবন-ভার নিবেদন করতে গুঢ় বেদনায় বিহ্বল সলজ্জ

দৃষ্টিতে শূর্পণখা তাকায় লক্ষ্মণের মুখের দিকে।—ক্ষত্রপ লক্ষণ! আমার এই বেদনাময় জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে নারীত্বের অপমান করবেন না। আমি প্রতারণা নই আর্য কুমার। আমি এই মর্তেরই নারী, মর্তজীবনের দীনতা, হীনতা, বেদনার উর্দ্ধে প্রেমের জীবনকে তুলে ধরবার রীতি আমি জানি। আমার জীবনের সমস্ত মালিন্য ক্ষমা করে তোমার জীবনের পাশে আমাকে গ্রহণ কর।

সকলকে চম্‌কে দিয়ে ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গীর মত সহসা সফোঁসে গর্জে ওঠেন সীতা। তাঁর অন্তরে অবদমিত অভিমান ক্রোধ-ঈর্ষা নিদারুণ দহন জ্বালাময় আক্রোষ রূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে শূর্পণখার উপর।—হীন-যোনিজা রাক্ষসী, নির্লজ্জ কামুকী, মায়াবিনী, কোন অধিকারে তুই এসেছিস এই পবিত্র কুটির অঙ্গনে! কোন দুঃসাহসে তুই আমার সম্মুখে আমার পতিকে প্রেম নিবেদন করতে এসেছিস! তোর জীবনের শূন্য ভাণ্ড নিয়ে তোর ঐ সুতনু-পণ্যা হয়ে বিলিয়ে দে জনে জনে। পাপীষ্ঠা কপটি, তুই এই মুহূর্তে কুটির ত্যাগ করে চলে যা দৃষ্টির অন্তরালে।

পঞ্চবটির আকাশ বাতাস হঠাৎ তপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষণবৈচিত্তে লজ্জাবোধ করেন রামচন্দ্র। তাঁর বক্ষফলকের অন্তরালে ক্ষন-দুর্বলতার অপরাধ লুক্কায়িত করতে তিরস্কারে দগ্ধ করেন শূর্পণখাকে। —পাপীয়সী নারী, আমি অসীম ধৈর্যে তোমার ঔদ্ধত্যের পরীক্ষা কর-ছিলাম, পবিত্র আর্য আচার কলঙ্কিত করতে উদ্যত হয়েছ তুমি রাক্ষসী। অযোধ্যার সিংহাসন কলঙ্কিত করতে চাও তুমি। কিংকরীরও অযোগ্যা এক নারী কোন স্পর্দ্ধায় প্রণয় নিবেদন করতে আসে অযোধ্যাপতির কাছে!

আহত ফনিনীর মত সফোঁসে গর্জে ওঠে শূর্পণখা। যে আনন্দ আবেগ আর বিশ্বাস নিয়ে এসেছিল সে পঞ্চবটীর কুটির অঙ্গনে তাঁর উষর জীবনে এক নব অতিথি বরণ করতে, তা এক লহমায় অগ্নিজ্বালা-ময় বিষবাষ্পের স্পর্শে শত ধিক্‌কারে চূর্ণ হয়ে যায়। তাঁর মনে হতে থাকে সম্মুখের তিনটি মূর্তি যেন তিনটি বিষকুম্ভ। তাঁর আয়ত

নয়ন যুগলে নৃত্য করতে থাকে একটা জ্বালা করাল লীলা।—কাকুস্থ্য রাঘব! যে পিতৃসত্য পালনের মিথ্যা গর্ব নিয়ে বনবাস ব্রত গ্রহণ করেছেন সে সকলই আপনার মিথ্যা আত্মপ্রতারণামাত্র। পুণ্যার্জনের পথটিও পুণ্যময় হওয়া উচিত। আপনার কর্মব্রত নীতিভ্রষ্ট কলুষ-লিপ্ত। নারী নির্যাতনে যে পুরুষ পৌরুষ বোধ করে তাকে আমি ঘৃণা করি। হীনমনা কাপুরুষ বলে গণ্য করি। জাত্যাভিমান আর বর্ণাভিমানের গর্ব আপনার গোপন হৃদয়কে কলুষিত করে রেখেছে। স্ত্রৈণ পুরুষ, পুরুষের নামান্তরমাত্র। ভোগপুত্তলী আর্যাগণ তাকে হৃদয়ে বরণ করতে পারে, কিন্তু বীর্যবতী রাক্ষস রমণীগণ সেই পুরুষদের উপেক্ষা করে।—তারপর গর্বোন্নত দৃষ্টিতে সীতার দিকে তাকিয়ে বলে,—শোন কটুভাষিণী, আমি নারী, তোমার হৃদয়ের চিত্র পুরুষের দৃষ্টি থেকে লুক্কায়িত রাখতে পার, কিন্তু আমার দৃষ্টি থেকে লুক্কায়িত রাখতে পারবে না। নারী জানে নারী-হৃদয়ের বার্তা। আমি জানি কোন নিষ্ঠা আর আদর্শের আকর্ষণে এক নারী দুই যুবকের সঙ্গিনী হয়ে দীর্ঘকাল বনবাস ব্রত গ্রহণ করতে পারে। আমি নারী, আমার চক্ষুকে প্রতারিত করা সহজ নয় সম্ভবও নয় জেনো রাঘব দয়িতা সীতা। তোমার একপাতিব্রত্যের মাল্যভূষণ আমার চক্ষুতে এক কপটি নারীর শুধু প্রতারণামাত্র। আর্য-রমণীগণই শুধু পুরুষের ক্রীড়া পুত্তলী, ভোগের সামগ্রী, পণ্যা হয়ে সুখী হতে পারে। রাক্ষস রমণীগণ হয় পুরুষের সর্বকার্যে সঙ্গিনী, কি সংসারে কি যুদ্ধে বা রাজকার্যে।

বাণবিদ্ধ কুরঙ্গীর মত যন্ত্রনাক্ত আহত সজল নয়নে সীতা তাকায় রাঘবের বদন পানে।

পত্নীর লাঞ্ছনায় আহত হয় রাঘবের ক্ষাত্রগর্ব। শূর্পণখার উদ্দেশ্যে রোষস্বরে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেন—সাবধান, বৈদেহীর চক্ষুর পীড়াদায়ক রাক্ষসী। এই মুহূর্তে তুমি আমার পঞ্চবটীবন ত্যাগ করে দূরে চলে যাও। ধৃষ্টা, দণ্ডকাধিপতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার পত্নীকে লাঞ্ছনার দণ্ড হবে শানিত তরবারিতে তার রসনাচ্ছেদন।

অট্টহাসিনী প্রগল্‌ভার মত উপেক্ষার অট্টহাস্যে শূর্পণখা প্রত্যুত্তর দেয়,—নরেশ্বর রাঘব, ক্ষত্রিয় রাজকুমার হয়েও রাজধর্ম জানেন না। আপনি হয়ত বিস্মৃত হয়ে গেছেন যে আপনি বর্তমানে বাস করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী জনস্থানে। সেই জনস্থানের অধিশ্বরীকে সম্মান জানাতে আপনাদের সংযতভাষ হওয়া উচিত বলে মনে করি। আপনারা বর্তমানে আমার শাসনাধীন। অবশ্য ভীত হবেন না, আপনারা আমার রাজ্যে সম্মানিত অতিথি। আমরা, শুধু অতিথিকে নয়, সমস্ত মানুষকে মর্যাদা দিতে জানি।

রামচন্দ্রের বক্ষোনিভৃতে ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসের আলোড়ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বীরোত্তমের দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে অপমানিতের জ্বালা। —ধৃষ্টা নারী তুমি বিস্মৃত হয়ো না দণ্ডকের অধীন জনস্থানও অযোধ্যার সিংহাসনের অধীন। আর তুমি অযোধ্যাপতি রাঘবেরই সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্পর্দ্ধিত ভাষণে মুখর হয়েছ।

—আমি বিস্মৃত হইনি রামচন্দ্র, ইক্ষ্বাকুদের পূর্বের দণ্ডক ছিল দানবাধীন ঘোর রাজ্য। বর্তমানে দশানন ভগ্নী শূর্পণখার শাসনাধীন একটা গণ-প্রজাতন্ত্রী স্বাধীন রাজ্য।

শূর্পণখার কথাগুলি শানিত বর্শাফলকের মত আঘাত করে রামচন্দ্রের হৃদপিণ্ডের ক্ষাত্র অহংকারে। রোষে অস্ত্র অন্বেষণ করেন। হঠাৎ শূর্পণখার অট্টহাস্যে চমকে ওঠেন—বীর রাঘব, বিস্মৃত হবেন না রক্ষোনারী শূর্পণখা আর্যনারী সীতার ন্যায় পুরুষের ভোগসামগ্রী নয়। নিরস্ত্রা শূর্পণখার হাতে অস্ত্র দিয়ে তাঁর বীরাঙ্গনারূপ দেখতে পারেন।

অপমানিতের ক্রুদ্ধনিঃশ্বাসে লক্ষ্মণকে আদেশ করেন রামচন্দ্র—এই ধৃষ্টা, পাপিয়সী রূপসীকে কুরূপা করে দাও সৌমিত্রি। চকিতে শূর্পণখাকে লক্ষ্য করে শানিত অসির আঘাত করেন লক্ষ্মণ।

চকিত ক্ষিপ্রতায় সরে দাঁড়ায় শূর্পণখা। কিন্তু শানিত অসির স্পর্শে আহত হয় তার নাসিকা-কর্ণ। শোনিত ধারায় সিক্ত হয়ে যায় তার বক্ষাবরণ। ক্রুর অট্টহাস্যে হেসে ওঠেন সীতা। বেদনা ক্রুদ্ধ

নয়নে রাঘবের দিকে তাকিয়ে শূর্পণখা বলে,—রাঘব, অতিথি যদি দস্যু হয়, দুষ্ট হয় তাঁর সমুচিত দণ্ডই আমার রাজ্যের বিধান। তোমাদের ললাটেও সেই বিধানই লিপিত। কিন্তু আমার ক্ষণিকের দুর্বলতার মোহে তোমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম, তাই তোমাদের চরম শাস্তি থেকে বিরত রইলাম। কিন্তু তুমি হয়ত মুক্তি পাবে না। জ্যেষ্ঠ রাবণ হয়ত তোমাকে ক্ষমা করবেন না। ক্রুদ্ধ রাবণ ক্রুদ্ধমৃগেন্দ্র সমান।

* * *

নিদারুণ মর্মযাতনায় বড় অস্থির বোধ করেন রাবণ। দুঃখীজনের, এই মর্তজীবনের প্রতি আর্তধিক্কার আজও শুনতে পান তিনি। যে বেদনা, যে আর্তক্রন্দন তাঁকে উন্মাদ উল্কা বানিয়েছিল, সেই আর্তক্রন্দন যেন আজও তাঁকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। তাঁর হৃদয়ের নিভৃতে আজও তিনি শুনতে পান সেই নিষাদ পল্লীর আর্তক্রন্দন, দেখতে পান মায়েদের সেই বেদনা আর লাঞ্ছনা বিরম্বিত সজল চক্ষু। আজও সেই দুঃখ-দীর্ণ মর্তের কোন দুঃখের লাঘব ঘটাতে পারেন নি। স্বর্গ-সুখ আজও বন্দী হয়ে আছে রাজা আর সম্পন্নের প্রাসাদে। বিষণ্ণ বিস্ময়ে তিনি ভাবেন,—গণ-শাসনের গণতন্ত্র রচনায়, সর্বজনের সমসুখের বিধান রচনায় জ্ঞানী-গুণী-ঋষি-মহর্ষিগণ নিতান্তই নিস্পৃহ। রাজ-সম্মান আর রাজ-কৃপা লাভই যেন তাঁদের সর্বকার্যের একমাত্র লক্ষ্য। আর তা যেন তাঁদের মানবতাবোধ থেকেও মহার্ঘ। রাজা বা বণিকের হৃদয় না থাকতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী-গুণীজন হৃদয়বাণ হবেন না কেন?—এ যেন এক দুর্গেয় রহস্য।

সত্যসন্ধ, অনসূয়, মানবতাবাদী রাবণ চিন্তার এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বড় বিষণ্ণবোধ করেন।—যে আদর্শ রূপায়ণ করতে ত্রিভুবনের রাজধর্মে বারংবার আঘাত করে ভেঙ্গে দিয়েছি তাদের আধিপত্যের দুর্গ, তাদের নখ-দন্ত উৎপাটন করে 'গণতন্ত্র' প্রবর্তন করতে উদ্যত হয়েছি, নীরবে নিরুত্তরে রাজকুল থেকে নিরন্তর শুনে আসছি শুধু

ধিক্কার;—রাবণ ক্রুর, রাবণ খল-লম্পট, রাবণ হীন। তারা কি তাদের স্বার্থ-ঘাতি আমার সমদর্শিতার মহান ব্রত নিষ্কণ্টকে উদ্‌যাপন করতে দেবে? তারা কি আমাকে ধ্বংস করতে তাদের গোপন হৃদয়-দুর্গে অস্ত্র সঞ্চয় করবে না?—প্রাসাদ পুরীর সরোবরের পাষণ সোপানে একাকী বসে তিনি ভাবছেন এসকল। ভাবনা তন্ময়তায় তিনি শুনতে পাচ্ছেন না পক্ষীর কুজন, চেয়ে থেকেও দেখতে পাচ্ছেন না কমল-শোভা, ঘ্রাণে বোধ করছেন না গন্ধপুষ্পের সৌরভ।

আচম্বিতে নিদারুণ এক বজ্রশিলার আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় তার সমস্ত ভাবনার তন্তু।—শুনলেন 'জনস্থানে পঞ্চবটীবনে শূর্পণখা নিগ্রীহিতা। বনবাসী রাম-লক্ষণ শূর্পণখার নাসা-কর্ণ ছেদন করে চরম নিগ্রহ করেছে জনস্থানে।'

স্থিরস্ফুলিঙ্গের মত দুই চক্ষু-তারকা ভ্রূকুটি কুটিল নিশ্চল করে উঠে দাঁড়ান রাবণ। যেন আহত এক দুরন্ত মৃগেন্দ্র অলক্ষ্যে শত্রুকে দেখতে পেয়ে প্রতিশোধে উদ্যত হয়েছে। প্রতিহিংসার ঝড়ে উত্তাল হয়ে ওঠে তার হৃৎপিণ্ড। ভয়ংকর নির্মমের মত নিষ্ঠুর আঘাত হেনে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন সভ্যতার শত্রু ঐ পাপাচারী কাপুরুষকে।

উদ্যত অস্ত্রে প্রচণ্ড উল্‌কা বেগে ধেয়ে যান জনস্থানে। কিন্তু না, শূর্পণখার বিনয় কথায় প্রতিহত হয় তার গতি, প্রশমিত হয় তার ক্রোধ।—জ্যেষ্ঠ, প্রণয়-পাগলিনী সামান্যা এক নারীর কারণে তোমার মহৎশক্তির অপচয় করো না। তারা বনচারী দুর্বল নর। জনস্থানে গণরোষ থেকে আমি তাদের রক্ষা করেছি। সামান্যকে নিধন করে তুমি তোমার পৌরুষ কলুষিত করো না।

—তবে? শূর্পণখা তুমি মহতী নারী। কিন্তু সেই পাপিষ্ঠ আমার স্নেহের কক্ষে আঘাত করেছে। আমি তাকে মার্জনা করতে পারি না।

—তুমিও তাদের স্নেহের কক্ষে আঘাত করে বুঝিয়ে দাও যাতনার জ্বালা।

মনে মনে পথ ও পন্থার সন্ধান করতে রাবণ কিছুক্ষণের জন্য শূন্য-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন দিগ্‌বলয়ের দিকে। তারপর সহসা ঝঞ্ঝাঘাত-বল্মীকস্তূপের মত কেঁপে ওঠে তাঁর সারা দেহ। চকিতস্ফুরিত বিদ্যু-রেখার মত খরপ্রভ হয়ে ওঠে তাঁর দুই নয়ন। দ্রুত গিয়ে রথে আরোহন করেন। সারথিকে নির্দেশ দেন,—মারিচের আশ্রম।

অসময়ে আশ্রমে দশাননকে দেখে বিস্মিত হন মারিচ। তাঁর কঠিন রূপ দেখে ভীতও হন। সভয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করেন।—আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল প্রভু দশানন ?

—না।

—কারণ ?

—মারিচ, ইতিমধ্যেই শূর্পণখার নির্যাতনের সকল সংবাদই বোধ হয় অবগত হয়েছ। দুরাচার রাঘব শূর্পণখাকেই শুধ্ আঘাত করেনি, সে আঘাত করেছে আমার আহত স্নেহের কক্ষে।

—আমি বুঝে উঠতে পারছি না, কোন দুর্বুদ্ধিতে রামচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তি এই দুষ্কার্য করলেন !

—আমি জানি মারিচ, এ কাজ তাদের স্বভাবের ব্যতিক্রম কোন কাজ নয়। তাদের সম্বন্ধে তোমার দুর্বলতা থাকতে পারে, মোহ থাকতে পারে, কিন্তু আমার নেই।

—আপনার অভিপ্রায় ?

—প্রতিশোধ গ্রহণ।

শিহরিত হয়ে ওঠেন মারিচ। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন,—কি উপায়ে ?

—ভীত হয়ো না মারিচ আমি তাদের নিধন করব না। বেদনা দিয়ে, বেদনার শাস্তি দেব। হ্যাঁ, ভগিনীর অনুরোধে আমি তাদের নিধন করব না।

বিহ্বলের মত তাকিয়ে থাকেন মারিচ।—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না প্রভু।

—আমি রাঘব দয়িতা সীতাকে হরণ করব। হ্যাঁ, হরণ করে

বুঝিয়ে দেব স্নেহকক্ষের আঘাত কত মর্মান্তিক হয়। আর সেই কার্যে তোমার এবং তোমার মায়ামৃগের সাহায্য প্রার্থী।

চমকে ওঠেন মারিচ। রাবণ বলে চলে,—তোমার ঐ স্বর্ণমৃগে প্রলুব্ধ হবেন সীতা। মৃগের সন্ধানে রাম কুটির ছেড়ে যাবেন দূরে। আরও দূরে। কণ্ঠানুকরণ পারদর্শি তুমি আর্ত রাম-কণ্ঠে, সীতা-প্রহরী লক্ষ্মণকে আহ্বান করবে। লক্ষ্মণ কুটির ত্যাগ করবে। পলকে আমি সীতাকে হরণ করব।

শিহরিত আর্তকণ্ঠে মারিচ বলে ওঠেন,—অসম্ভব, প্রভু অসম্ভব। আমি জানি, রামচন্দ্র এক অসাধারণ শক্তিমান পুরুষ। আমি অনুরোধ করছি এ কার্য থেকে আপনি বিরত হোন।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রাবণ বলেন,—মারিচ তুমি দুষ্কুলজাত। তোমার ভগ্নীর প্রতি এ'রকম মর্যাদাহানিকর লাঞ্ছনা তোমার ন্যায় ভীরু হয়ত নীরবে সহ্য করবে। কিন্তু পুরুষ রাবণ তা সহ্য করতে পারে না, সহ্য করবে না।

মারিচের অন্তরে ধ্বনিত হতে থাকে এক সর্বনাশের বার্তা। দ্বিধা-পীড়িত মারিচ অনুনয়ের সুরে বলেন,—প্রভু, আপনার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত হতে আপনাকে পুনরায় অনুরোধ করছি। যারা সতত প্রিয় বাক্য বলে এমন লোক অধিক। কিন্তু, অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা দুর্লভ।

অশাসিত রোষে রাবণ বলেন,—মারিচ, আমি আমার সিদ্ধান্তে সংশয়গ্রস্থ হয়ে তোমার নিকট পরামর্শ চাইতে আসিনি। আমার সঙ্কল্পিত কার্যের দোষ-গুণ জিজ্ঞাসা করতেও আসিনি। আমার সঙ্কল্পিত কার্যে তোমার সাহায্য যাচ্ঞা করতে এসেছি। সম্মত হও তো উত্তম, অন্যথায় পরিণামের জন্য প্রস্তুত হয়ে থেকো।

দারুণ শঙ্কার আবর্তে বিমূঢ় হয়ে মারিচ তাকিয়ে থাকেন রাবণের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে স্বর্ণমৃগ সহ নীরবে রাবণের অনুসরণ করতে থাকেন। কল্পনা করতেও আতঙ্ক হয় মারিচের। প্রতিটা মুহূর্ত যেন

ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করছে তার বক্ষপঞ্জরে। কি এক ভয়ঙ্কর অপচিত্ততার শিকার হয়ে চলেছে সে।

স্বর্ণ-মৃগ স্বাধীনভাবে বিচরণ করছে পঞ্চবটী বনে। বননিভৃতের অন্তরালে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে আছেন রাবণ আর মারিচ। মৃগলুব্ধ সীতার আবেদনে রাম মৃগ অনুসরণ করে চলে যান দূরে বহু দূরে, দৃষ্টির অন্তরালে। সহসা অলক্ষ্য থেকে বিপন্ন রামের আর্তকণ্ঠ শুনা যায়।—ভাই'রে লক্ষ্মণ, আমি বিপদাপন্ন। আমার অন্তিমকাল বুঝি ঘনিয়ে এল।—আতঙ্কে চমকে ওঠেন রাম। এক সর্বনাশের ধ্বনি ধ্বনিত হয় তার হৃৎপিণ্ডে।

আতঙ্কে চমকে ওঠেন সীতা—লক্ষ্মণ, তুমি কি শুনতে পাচ্ছনা বিপদাপন্ন রামের আর্ত আহ্বান! তথাপি তুমি নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চেষ্ট কেন? আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারছিনা সৌমিত্রি বিপন্ন রাঘবের আবর্তমানে তুমি একাই আমার রূপের পূজারী হয়ে ভোগ করবে! ভাবতেও পারছিনা তুমি আত্মসুখে এত হীন এত নীচ হতে পার!

সীতার পরুষ বাক্যে পীড়িত হন লক্ষ্মণ। রূঢ় ভাষণের বিষজ্বালায় ক্ষুব্ধ লক্ষ্মণ চলে যান বিপন্ন রাঘবের অনুসন্ধানে। পলক অবকাশে ক্রুদ্ধ শার্দুল যেন হরণ করে নিয়ে গেল তার শিকার,—পঞ্চবটীর রাঘবের কুটির অন্ধকার করে রাবণ তার সবল বাহু বেষ্টনে হরণ করে নিয়ে গেল সীতাকে। সীতাসহ রাবণের রথ দ্রুত চলতে থাকে লঙ্কার পানে।

সীতার আর্তক্রন্দনে বিদীর্ণ হয়ে যায় আকাশের বক্ষ। ব্যর্থ হয় কোমলাঙ্গীর আত্মরক্ষার সকল চেষ্টা। রাবণের সবল বাহু বেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না বৈদেহী। রথ চলে দ্রুত তালে। শুনা যায় বৈদেহীর আর্তবিলাপ আর অভিশম্পাতের কঠিন ভাষা—পাপিষ্ঠ ধর্ষক, তুমি জান না কার ধন তুমি অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছ। পাপিষ্ঠ রাক্ষসাধম, যদি নিজের মঙ্গল চাও, তবে আমাকে মুক্ত করে দাও। অন্যথায় পরুষ প্রধান সর্বাস্ত্রবিশারদ রাঘবের তীক্ষ্ণ শর থেকে তুমি নিস্তার পাবে না।

উচ্চরবে হেসে ওঠেন রাবণ। বলেন,—আমি সবই জানি সীতা। জানি না শুধু পুরুষ-প্রধান রামচন্দ্র কেমন করে নারী নির্যাতনে পৌরুষ-প্রদর্শন করতে পারেন। জানি না শুধু সর্বাস্ত্র বিশারদ রামচন্দ্র নারী নিগ্রহে অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেন। জানি না শুধু নারী নিগ্রহে নারী উচ্চ হাস্যে আত্মতৃপ্তি পেতে পারে। বিস্মৃত হয়োনা রামঘরণী সীতা, তোমার পঞ্চবটীর কুটির অঙ্গনের মৃত্তিকা থেকে এখনও শূর্পণখার শোনিত-কলঙ্ক অপসৃত হয়ে যায় নি।

আত্মবিলাপে বলতে থাকেন সীতা,—দুর্ভাগিনী আমি, রাঘবের সহ-বনবাসিনী হয়ে কি দুরপনেয় কলঙ্কই না লেপন করে দিলাম তার পবিত্র ললাটে। এক ধর্ষকে কবলিত হলাম আমি।

—বিলাপ করো না বৈদেহী, আমি তোমার কোন অমর্যাদাই করব না। তোমার বনবাস ব্রতও ভঙ্গ করাব না। তুমি বাস করবে লঙ্কার আশোক বনে। তোমার সেবায় নিয়োজিত থাকবে রাজপুরনারীগণ। নারী নিগ্রহ আমি ঘৃণা করি ও পাপ কার্য বলে মনে করি। অন্যথায় ত্রিভুবন বিজয়ী রাবণ অনায়াসে তোমার সমস্ত নারীত্বের মর্যাদাকে মুহূর্তে লুণ্ঠন করতে পারে। কোন শক্তি নেই তা প্রতিরোধ করতে পারে। সীতা, তুমি তোমার সমস্ত মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই লঙ্কায় বাস করতে পারবে। শূর্পণখার নির্যাতনকারী রাম-রক্ষ্মণ যেদিন অনুতপ্ত হয়ে তোমাকে যাচ্ঞা করবেন সেদিনই তোমাকে আমি রামের হাতে অক্ষতে প্রত্যার্পণ করব।

॥ ১১ ॥

রাঘবের ভগ্নহৃদয়ের আর্তনাদ, অশান্ত অসহায় বিলাপ আর বেদনা বিগলিত অশ্রুধারায় সিক্ত করে দেয় পঞ্চবটীর শূন্য হৃদয়,—যে ভয়ানক সর্বনাশের সন্দেহ করেছিলাম লক্ষ্মণ সেই সত্য হল। পঞ্চবটীর কুটির শূন্য হয়ে গেল।

রাঘবের চক্ষুর দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ সায়কের মত বনলতা আর সমস্ত শূন্যতা ভেদ করে সীতাকে অন্বেষণ করে ছুটতে থাকে। শূন্য নির্জন বনে 'সীতা-সীতা, বৈদেহী, বৈদেহী', তুমি কোথায় আছ শব্দ করে উত্তর দাও।—বলে আর্তকণ্ঠে সকাতরে চীৎকার করতে থাকেন। রাঘবের সেই আর্তকণ্ঠ তরুলতা স্পর্শ করে বায়ু ভরে ভেসে যায় শূন্যে দূর-দূরান্তরে। বৃক্ষলতার হৃদয় থেকে শুধু প্রতিধ্বনি ভেসে আসে—নেই, সে নেই।

—তবে কি স্রোতস্বিনীর খল সলিল আমার সীতাকে অপহরণ করেছে! দ্রুত চলে যান গোদাবরী তটে। হতাশ বিষণ্ণে বলেন,—না সে চিহ্নও তো নেই! সৌমিত্রি! বৈদেহীর এই অন্তর্ধান আমার উদ্বিগ্ন চিত্তের বিভ্রম নয়ত?—পুনরায়—'সীতা-সীতা, বৈদেহী-বৈদেহী' বলে তারস্বরে চীৎকার করতে থাকেন রাঘব। উন্মাদের মত বারংবার ডাকতে থাকেন। প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চেষ্টা করেন বনমর্মরে মিশে আসে কিনা বৈদেহীর কণ্ঠ। কোন প্রত্যুত্তর আসে না। কেঁদে ওঠে অন্তর। আঁখি অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে আসে।—কোথায় গেল সে! কতদূরে গেল সে! বনের তরুলতা কি সে সংবাদ দিতে পারে না? দু'দণ্ড পূর্বেও যে আশ্রম অঙ্গনে স্ফুট পদ্মের মত শোভমানা ছিল, আর এক্ষণে সে নেই! স্বেচ্ছায় সে নিশ্চিহ্ন হতে পারে না।

তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেন বন, প্রান্তর, বনোপান্ত। কিন্তু বৈদেহীর কোন চিহ্ন দেখতে পান না। কেঁদে কেঁদে বলেন,—সৌমিত্রি

দুঃসহ এই ঘটনা যেন অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত আমার হৃদয় চূর্ণ করে দিয়ে গেল। এ বেদনা প্রকাশের কোন ভাব নেই, বিলাপেরও কোন ভাষা নেই। আমার হৃদয় ভিন্ন অনুভব করবারও ত্রিভুবনে কোন হৃদয় নেই। আমি বারংবার তোমাদের সাবধান করেছিলাম লক্ষ্মণ, আমরা এমন এক শত্রু বেষ্টিত অঞ্চলে আছি যাদের হৃদয় বলে কিছু নেই। ভোগ-সর্বস্ব হীনশোনিতজ রাক্ষসদের কাছে নারীর মর্যাদা অতি তুচ্ছ। জানি না কোন পাপিষ্ঠ রাক্ষস বৈদেহীকে ধর্ষণের জন্য না হত্যার জন্য অপহরণ করেছে। রাক্ষস-ধর্ষিতা হওয়ার পূর্বেই বৈদেহী যেন দেহ ত্যাগ করে।—রামচন্দ্র উন্মনা দৃষ্টিতে শূন্যপানে তাকান। অন্তরে অন্তরে কি একটা যেন ভাবছেন। যেন মনে মনে দেখছেন রাক্ষস তার বৈদেহীকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছে। বৈদেহী, বীর রাঘব, বীর লক্ষ্মণ আমাকে রক্ষা কর আমাকে রক্ষা কর বলে ভীতার্ত্ত কণ্ঠে কেঁদে কেঁদে চীৎকার করছে। অকস্মাৎ রামের চক্ষুতে ক্রুদ্ধ শার্দুলের দৃষ্টি ফুটে ওঠে। প্রমত্ত গর্জনে বলে ওঠেন,—সাবধান রাক্ষস, বৈদেহীকে স্পর্শ করলে রাক্ষসের শোনিত-স্রোতে ত্রিভুনকে স্নান করাব। জীবন্ত দগ্ধ করব সমস্ত রাক্ষসের দেহ, নারী-পুরুষ শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে।

সহসা লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে বলেন,—সৌমিত্রি, সম্পাতি নন্দন জটায়ু বৈদেহীকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বৈদেহীকে অপহরণ-ষড়যন্ত্রে আমি তাকে সন্দেহ করি। হীন-শোনিত জন্মা অনার্যদের আমি অবিশ্বাস করি, ঘৃণা করি। কারণ কোন দুষ্কার্যই তাদের কাছে দুষ্কার্য নয়। নারীর মর্যাদা দান তাদের সংহিতায় অজ্ঞাত। আমি সেই বিশ্বাস ঘাতক অনার্য প্রতারককে হত্যা করব।

রাবণের অস্ত্রাঘাতে ছিন্নবাহু বৃদ্ধ জটায়ু রক্তবমনে মৃত্যু পথযাত্রী। উদ্যত-অস্ত্র রাঘবের দিকে ক্লান্ত বিবর্ণ নেত্রে তাকিয়ে বলে,—দশরথাত্মজ রাঘব, মিথ্যা-সন্দেহ নির্ভর কর্ম আক্ষেপের কারণ হয়। তোমার অস্ত্রাঘাতের আর প্রয়োজন হবে না, তোমার বৈদেহীকে রক্ষা করতে পাষণ্ড রাবণের অস্ত্রাঘাতে আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি। আমার

প্রাণ থাকতে দু'টি কথা তোমাকে বলে যাই,—লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণ তোমার সীতাকে হরণ করেছে উদ্ধার করতে ছদ্মবেশী কবন্ধ দনুর সাহায্য তোমার অপরিহার্য। ধীরে ধীরে নিস্পন্দ হয়ে গেল জটায়ুর দেহ।

একটা উদ্যত ক্রোধের উচ্ছ্বাস যেন ছড়িয়ে পড়ে উতলা চৈত্রের আকাশে—লক্ষ্মণ, পাপিষ্ঠ রাবণ বৈদেহীকে নিয়ে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল বা রসাতলে, সাগরে বা পর্বত কন্দরে ত্রিভুবনের যে স্থানেই পলায়ন করুক আমার রোষ থেকে তার আর নিস্তার নেই। উদ্ধত রাক্ষসদের দণ্ড না দিলে আমার ইক্ষ্বাকু কুল গৌরব ভূলুণ্ঠিত হবে।

—কিন্তু, অনার্যরাজা দনু····।

—লক্ষ্মণ, তুমি রাজনীতিতে অজ্ঞ। সন্দেহ-দোষ তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। রাজনীতিতে মানবিক গুণই দোষ। যে কোন উপায়ে কার্যোদ্ধারই রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা। রাজনীতিতে অন্তরের বন্ধুত্ব মিথ্যাচার মাত্র। স্বার্থোদ্ধারে আমরা সকলেরই বন্ধুত্ব অর্জনে প্রয়াসী হব। দনু অনার্য হলেও রাজা, সমস্বার্থসূত্রে আবদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গের সহায়তায় রাক্ষসরাজ রাবণকে নিধন করতে সক্ষম হলে আমার দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হবে—দাক্ষিণাত্যে ইক্ষ্বাকু রাজবংশের প্রতিষ্ঠা আর সীতার উদ্ধার। সৌমিত্রি আমার গোপন অন্তরের একমাত্র প্রতিশ্রুত কর্তব্য ত্রিভুবনে ইক্ষ্বাকু বংশের প্রতিষ্ঠা। আমি বনবাসেও সেই কর্তব্যপথ থেকে বিচ্যুত হইনি। সে পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি। গণশাসনকামী রাবণই আমার প্রধান শত্রু। আমার মহৎ কর্তব্য পালনে দাক্ষিণাত্যের রাজণ্যবর্গের নিরঙ্কুশ সাহায্য লাভে আমি বঞ্চিত হব না। আমার প্রতিশ্রুতি, মুখে উচ্চারিত প্রতিশ্রুতি মাত্র, উদ্দেশ্য থাকবে গোপন।

—রাঘব, শুনেছি কবন্ধরূপী দনু বুদ্ধিমান ও দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। কোন সময় পুরন্দরের সঙ্গেও প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিল?

—যথার্থই শুনেছ। তার বুদ্ধি ও সাহায্য আমাদের অপরিহার্য। বিরহ বেদনা কাতর হয়েও গোপন অন্তরে একটা অব্যক্ত হর্ষ

অনুভব করছিলেন রাম। বনোপবন শোভা রাঘবের বিরহ কণ্টকিত অন্তরে যেন শান্তির প্রলেপ দিয়ে যায়। তাঁর বক্ষঃপুটে সঞ্চিত রাজ্য কামনার পরাগ ধমনী-ধারায় উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। দূর দক্ষিণগগন-বলয়ের দিকে তাকিয়ে ক্ষাত্রগর্বে গর্বিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেন তারা। জনস্থানের সীমান্ত অতিক্রম করে এগিয়ে চলেন। হঠাৎ দেখে চমকে ওঠেন,—কিম্ভূতকিমাকার ঘোর দর্শন এক জীব এসে তাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলে,—কে তোমরা? যুদ্ধ কর। অথবা—সহাস্যে বলে,—আতিথ্য গ্রহণ কর।

রামচন্দ্র বুঝতে পারলেন এ'ই কবন্ধরূপী দনু। আলিঙ্গন করে বলেন,—বন্ধু, আমি তোমারই সাহায্য ভিক্ষার্থী। সকলই শুনেছ, সকলই জান। পথ ও পন্থার পরামর্শ দিয়ে সাহায্য কর।

—নরেশ্বর, আমি সকলই শুনেছি, সকলই জানি। দাক্ষিণাত্যে রাজার অভাব নেই। দণ্ডকে ঋষি-মহর্ষিরও অভাব নেই। তোমার বিষণ্ণতার কারণ কি, ভয়ই বা কিসের! শোক বিহ্বলতা আর দুর্বলতা উদ্দেশ্য-সাধন-পথের কণ্টক জানবে।

—কিন্তু শুধু মনোবলই তো মহাপরাক্রান্ত রাবণ নিধনে যথেষ্ট নয়। তুমি যদি সত্যনিষ্ঠ সুহৃদ হও পন্থা নির্দ্ধারণ কর।—তাপিত চিন্তার ক্লেশে ক্লান্ত নিরুপায় রামের কণ্ঠে একটি আশ্বাসময় ছায়া অন্বেষণের সুর ধ্বনিত হয়।

—হ্যাঁ উপায় আছে রাঘব।

উপায় আছে শুনে রামের নয়ন হর্ষময় হয়ে ওঠে। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন,—বল বন্ধু, কি সেই উপায়?

—শোন নরনাথ রাম, দাক্ষিণাত্যের সকল রাজাই রাবণের প্রতি বিরূপ। আর সকল রাজাই কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনকে মান্য করে। তোমরা বিপন্ন ও দুর্দশা গ্রস্থ। অনুরূপ দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিকেই তোমাদের মিত্ররূপে গ্রহণ করতে হবে।

—উত্তম।

—কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনচ্যুত, তোমাদেরই ন্যায় বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্থ

সুগ্রীবকে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ কর। ছলে বলে কৌশলে কিষ্কিন্ধ্যাধি-পতি বালিকে নিধন করে সুগ্রীবকে সিংহাসন দান কর। আর বালি-নন্দন অঙ্গদকে কর যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত, তবেই তোমার উদ্দেশ্য সাধনের পথ সুগম হবে।

—বালিকে মিত্ররূপে লাভ করবার সহজ পথ বলছ না কেন?

—বালি, লঙ্কেশ্বর রাবণের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ। বালি আর রাবণ উভয়েই দুর্জয় শক্তিধর।

—সুগ্রীবের অবস্থান?

—ঋষ্যমূক পর্বতে। আমার রাজ্য থেকে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে গিয়ে তারপর সহজ সরল পথে দক্ষিণে অপূর্ব শোভাময় পম্পা সরোবর, মাতঙ্গ ঋষির আশ্রম ও ঋষ্যমূক পর্বত। সুগ্রীবের মৈত্রীলাভ করলে লাভ করতে পারবে আর একটি মহারত্ন, পবন-নন্দন হনুমন্ত।—অসাধারণ শক্তিধর, ন্যায়নিষ্ঠ ও অসাধারণ পণ্ডিত। হনুমানের সৌহার্দ লাভ করলে ত্রিভুবনে তোমার আর কোন ভয়ের কারণ থাকবে না।

—উত্তম, সুহৃদ তোমার উপদেশ গ্রহন করলাম।—রাম আলিঙ্গন করলেন দনুকে।

* * *

ঋষ্যমূক পর্বত—স্ফটিক স্বচ্ছ সলিলা পম্পা—ঋষি-মাতঙ্গের আশ্রম—মুক্তি প্রতীক্ষতা সবরী। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ।

হঠাৎ বিচিত্র বেশধারী অপরিচিত দুই যুবককে পর্বতে আরোহণ করতে দেখে বিস্মিত হন হনুমান, চিন্তিতও হন। আপন আবাস ছেড়ে তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ান। অতি শোভন বচনে বলেন,—সুধী, আপনাদের রূপ,-দেবতা, ঋষি বা তপস্বীর ন্যায়, অথচ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় অস্ত্র সজ্জিতও বটে। আপনাদের দেখে পর্বতবাসী মৃগাদি বনচরগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত। আপনারা শান্তিপ্রিয় না যুদ্ধপ্রিয়। কি উদ্দেশ্যেই বা আপনারা এই দুরারোহ পর্বতে আরোহণ করছেন?

—মহাশয়, আমরা মহাবলী সুগ্রীবের সাক্ষাৎ কামনা করে এই পর্বতে আরোহণ করছি। আমরা শান্তিপ্রিয়। আমরাও সুগ্রীবের

ন্যায় দুর্দশাগ্রস্থ। আমরা তাঁর সখ্য কামনা করি।

—সত্যই শুনেছেন। আপনারা বালির চর নন সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু আপনাদের সত্য পরিচয় জানতে ইচ্ছা করি।

মুখপাত্র লক্ষ্মণ বলেন—আমরা ইক্ষ্বাকু বংশিয় অযোধ্যপতি দশরথাত্মজ রাম-লক্ষ্মণ। জ্যেষ্ঠ মহাধনুর্ধর দাশরথী রাম ও আমি অনুজ লক্ষ্মণ। দুর্মতি রাবণ আমার ভ্রাতৃজায়াকে অপহরণ করে আমাদের বনবাসের দুঃখ আরও বৃদ্ধি করেছে।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেন,—সৌমিত্রি, এই সুদেহী মহাশয়ের পরিচ্ছন্ন সংস্কৃত উচ্চারণ ও সুশালীন সুবিন্যস্ত ভাষা শুনে মনে হয় ইনিই দনু কথিত 'হনুমন্ত্র'।

লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে স্মিতহাস্যে হনুমান বলেন,—সত্য অনুমান করেছেন রামচন্দ্র,—আমিই সুগ্রীবের একান্ত সচিব পবন-নন্দন হনুমান। সুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আপনারা আমার অনুসরণ করুন।

রামের অন্তরে এক হর্ষের অনুভূতি জাগে। এক নির্ভরের সম্ভাবনায় বক্ষের পৌরুষ আন্দোলিত হয়ে ওঠে।

সুগ্রীবের গোপন আবাসের অন্তর্মণ্ডলে আলোড়ন জাগে। কক্ষদ্বারেই দাঁড়িয়েছিলেন সুগ্রীব। অপরিচিতের দর্শনে হঠাৎ চম্‌কে ওঠেন তিনি। ইঙ্গিতে হনুমানকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। প্রসন্ন বদনে হনুমান বলেন,—বন্ধুবর সুগ্রীব নিঃশঙ্ক হও। দেবতুল্য যুবাগণ দশরথাত্মজ রাম-লক্ষ্মণ। তোমারই ন্যায় রাজ্য চ্যুত নির্বাসিত ও বিপন্ন। পাপিষ্ঠ দশানন রামের ভার্যা হরণ করে তাঁদের আরও বিপন্ন করে তুলেছে। তোমার মৈত্রী কামনা করে দুর্গম পথ-যন্ত্রনা সহ্য করে তোমার কাছে এসেছে। তুমি তাঁদের সাদরে গ্রহণ কর। মৈত্রী স্থাপন কর।

—হনুমান, আর্যপুরুষদের দুঃখের কথা শুনে আমি মর্মপীড়া বোধ করছি। কিন্তু, আমি নিজেই শক্তিহীন বিপন্ন। আমি তাঁদের কি সাহায্য করতে পারি?

—সুগ্রীব, অতীত ও বর্তমানই সব নয়। ভবিষ্যতের জন্যই মানুষ বর্তমানকে অবলম্বন করে। তুমি তাঁদের সাদরে গ্রহণ করে মৈত্রী স্থাপন কর। যুবাগণ তেজস্বী ও বীর বলে মনে হয়।

প্রসন্ন হাস্যে হস্ত প্রসারিত করে সুগ্রীব বলেন—হে মহাত্মন্, আপনারা ধর্মাত্মা ও তপোনিষ্ঠ। আমার সৌহার্দ কামনা করে আপনারা আমাকে কৃতার্থ, সম্মানিত ও লাভবান করেছেন। আমার সখ্য যদি আপনাদের প্রীতিকর হয় তবে আমার প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করে চিরস্থায়ী পাণি মর্যাদা বন্ধন করুন।

রাম অতি হৃষ্ট মনে সুগ্রীবের পাণি পীড়ন করে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। তারপর অতি বিষণ্ণ হাস্যে সুগ্রীব বলেন,—সখা রামচন্দ্র, আমি এক রাজ্যহীন রাজা, বলহীন বলবান। আপনার এই মহৎ যজ্ঞে আত্মাহুতি ভিন্ন আমি আর কি দিতে পারি।

—মিত্র, ত্রিভুবনে মহত্তম ত্যাগ, আত্মত্যাগ। স্থির বুদ্ধি আর দৃঢ় নিষ্ঠায় আত্মত্যাগে প্রস্তুত হৃদয় বিরল। আপনার এই প্রতিশ্রুতি আমাকে অভিভূত করেছে। আপনার এই মহৎ হৃদয়ের মর্যাদা আমি দিতে পারব কিনা জানি না, তবে মিত্র-হৃদয়ে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আপনাকে যথামর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না করে, আপনাকে যোগ্য বলের অধিকারী না করে, আপনার সাহায্য যাচ্ঞা করে বিব্রত করব না।

সবিস্ময়ে সুগ্রীব ভাবেন—এ কি অসম্ভব প্রতিশ্রুতি!—জিজ্ঞাসা করেন,—অরিসূদন রাঘব, আপনার এই প্রতিশ্রুতির পশ্চাতে কোন্ দুরূহ চিন্তা ক্রিয়া করল?

—মিত্র সুগ্রীব, কিষ্কিন্ধ্যার যোগ্য অধিকারী আপনি। আজ আপনি সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও চিরকাল বঞ্চিত থাকতে পারেন না। আর কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনের অধিশ্বর হওয়ার অর্থ দক্ষিণাবর্তের এক মহাপরাক্রান্ত সিংহাসনের অধিশ্বর হওয়া।

—মিত্র রামচন্দ্র, মহাবলী বালি কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠান থাকতে সে কথা কল্পনা করতেও ভয় হয়।

—সুগ্রীব, হতাশা বীরের ধর্ম নয়। অরিত্রাস দাশরথির হাতে অস্ত্র থাকলে অবলীলায় সে ত্রিভুবন জয় করতে পারে। বালির বল তুচ্ছ।

—বন্ধু রাঘব, বালির বল আপনার অজ্ঞাত। একমাত্র রাবণই তাঁর প্রতিদ্বন্দিতা করতে সক্ষম। সেই কারণেই দুই মহাবলী মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ।

সুগ্রীবের দুর্বলতা আঘাত করে রাঘবের বীরত্বের অহঙ্কারে। সদম্ভে তিনি বলেন,—বন্ধু, রাঘবের অমোঘ অস্ত্র ত্রিভুবন সংহারে সক্ষম। আমি আপনাকে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিতে পারি,—আমি, আমার অব্যর্থ অস্ত্রাঘাতে বালি সংহার করে আপনাকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করব।

সংশয়হাস্যে সুগ্রীব বলেন,—হয়ত সত্য, কিন্তু উপায় আমার অজ্ঞাত।

—মিত্রবর সুগ্রীব, আপনার স্বার্থে আমার স্বার্থ যুক্ত হয়েছে। আমরা চির মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আমি আপনাকে পথ নির্দেশ করছি,—আপনি কিষ্কিন্ধ্যায় বালিকে দ্বন্দ যুদ্ধে আহ্বান করুন। আমি আপনাদের যুদ্ধকালে অব্যর্থ বাণাঘাতে বালির বক্ষ বিদীর্ণ করব।

—উত্তম বন্ধু, যদি তাহাই আপনার বিবেচিত পন্থা হয়, আমি তা মান্য করব।

* * *

উদ্বেগমুক্ত কিষ্কিন্ধ্যার প্রাসাদে সে দিন একটা উৎপাতের মত এসে আঘাত করে সুগ্রীব। মহারাজ বালি বিস্মিত হন। বিরক্তও হন। তারা দেবীর মনে সন্দেহ জাগে।—কোন বলে বলীয়ান হয়ে সুগ্রীব এসেছে কিষ্কিন্ধ্যায়!

মহারাজ বালি সহ্য করতে পারেন না সুগ্রীবের উচ্চ ভাষণ।

তারাদেবী নিষেধ করেন—সুগ্রীবের উদ্ধত বলের রহস্য অবগত

না হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সঙ্গত নয়।

বালিকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করেন সুগ্রীব। এ ঔদ্ধত্ব সহ্য করতে পারেন না বালি। স্পর্দ্ধার পরিমাপ করতে ইচ্ছা হয়। পুরী নিষ্ক্রান্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন। প্রথম আঘাতেই পলায়ন করে সুগ্রীব। কিন্তু, না; পুনরায় এসে এক মহাউৎপাতের মত আস্ফালন করতে থাকে। বিরক্তি ক্রোধ ও উত্তেজনায় বেরিয়ে আসেন বালি। সিংহ গর্জনে দ্রুত এসে আক্রমন করেন,—পাপিষ্ঠ, তোর স্পর্দ্ধা চিরতরে স্তব্ধ করে দেব। নিদারুণ মল্লযুদ্ধে আচম্বিতে শরাহত হয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়েন বালি। ভাবতে পারেন না বালি, দ্বন্দ যুদ্ধে শরের আঘাত কি করে সম্ভব হল! দ্বন্দ যুদ্ধে এ বিশ্বাস ঘাতকতা কোন কাপুরুষের দ্বারা সম্ভব হল!

পরিজনের আর্তক্রন্দনের রোল ওঠে। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর বালি আর্তকণ্ঠে শান্তনা দেন তারাদেবীকে,—প্রিয়ে, কোন হীন-চেতা কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তোমার পতি বীর, বালি বীরের মৃত্যুই বরণ করছে। ধিক্কার দাও সেই অজ্ঞাত দুর্জনকে, যে অন্যায় ভাবে আমাকে হত্যা করল।

অস্ত্রধারী রামচন্দ্র এসে দাঁড়ান বালির সম্মুখে। রক্তলিপ্ত মুখে মৃত্যু-যন্ত্রনা কাতর বেদনার্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বালি বলেন,—তুমিই বুঝি আমার হত্যাকারী কাপুরুষ? নির্মম নির্লজ্জ জাত্যাভিমানী আর্য ক্ষত্রিয় তুমি হীণচেতা ক্ষাত্রধর্মদ্রোহী প্রতারক। তুমি সত্য-হন্তারক, ন্যায়নীতির লুণ্ঠক, হীনবীর্য, কপটাচারী ত্রিভুবনের কলঙ্ক।

অবিচল চিত্তে দাঁড়িয়ে থেকে উত্তর দেন রাম,—মহারাজ বালি, তুমি ধর্ম, অর্থ, কাম ও লোকাচার না জেনে বৃথাই আমাকে নিন্দা করছ। এই শৈল কানন সমন্বিত দেশ ইক্ষ্বাকুগণের অধিকৃত। ধর্মাত্মা ভরত এই রাজ্যের শাসনকর্তা। আমি ধর্মের প্রসার কামনায় তাঁর আদেশে পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করছি। রাজ-ধর্মের শাসন প্রতিষ্ঠা করছি। তুমি কামপরায়ণ। রাজধর্ম পালন করছ না। তোমার বিগর্হিত কর্মে ধর্ম

পীড়িত হচ্ছে। তোমাকে শাসন না করলে আমি পাপগ্রস্থ হতাম, তাই আমি তোমাকে শাসন করলাম। আমি তোমাকে ক্রোধ বশে বধ করিনি। তোমাকে বধ করে আমার কোন মনস্তাপও হয়নি।

—ধর্মের ধ্বজাধারী অধার্মিক, ভণ্ড পাপাচারী রাম, আমি তোমার সকল উদ্দেশ্যই জানতাম। জানতাম না শুধু সুগ্রীবের মিত্র হয়ে কাপুরুষের মত আমাকে হত্যা করতে ভীরুর মত আত্মগোপন করে আছ। তৃণাবৃত কূপ আর প্রচ্ছন্ন অগ্নির মতই তুমি পাপাচারী।— বলতে বলতে ধীরে ধীরে নিভে গেল কিস্কিন্ধ্যার দীপ।

* * *

শেষ চৈত্র-রজনী। হাস্যময় অংশুমালী তখন নিশার মধ্যগগনে। উন্মত্ত সাগরের দক্ষিণ বায়ু চম্পক-চামেলীর মদগন্ধে ভরা। একটা নিঃসঙ্গ নিশি-পক্ষী দুর্বোধ্য ভাষায় গান গেয়ে সন্তরণ করে বেড়াচ্ছে জ্যোৎস্না-কাশে। ঘুমিয়ে পড়েছে ত্রিকূট শির্ষের বৃক্ষলতা। ঘুমায়নি শুধু নিঃসঙ্গ ঐ নিশি-পক্ষী আর নিঃসঙ্গ রাবণ। অসম্পন্ন কর্তব্য চিন্তার একটা ভীষণ তক্ষক শিশু যেন অদ্ভুত জ্বালায় অধীর করে তুলছে তাঁকে। দিবস রজনীর প্রতিটি মুহূর্ত যেন একটা দুশ্চিন্তার সেবা করে চলেছেন তিনি।—প্রবলের উৎপীড়ন-বিভীষিকা থেকে দুর্বল সেবক জাতিকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু মড়ক দুর্ভিক্ষ-মহামারী আর সর্বনাশ থেকে তাদের আজও মুক্তি দিতে পারিনি। সংহারআমার ধর্ম নয়। সংহারের ভস্মস্তূপে আমি চাই নতুন সৃষ্টি। আমার সমদর্শিতার নীতিতে সমাজ বিন্যাসে নব-বিধানের এক একটি ধারা হবে স্বর্গের এক একটি সোপান। হে সর্বদর্শি ঈশ্বর, তুমি ত জান, কোন গভীর অভিমান আমাকে করেছে বিদ্রোহী। হে ঈশ্বর তুমি ত জান, এই সুন্দর বসুন্ধরার সকল আনন্দ আর অমৃত-রস কার আগুনে জ্বলে যায়। তোমার ঐ মধুময় চন্দ্রালোক স্নিগ্ধ করতে পারে না আমার মনের জ্বালা। আমি চেয়েছি এই সুন্দর

ধরণী থেকে মুছে দিতে, যা কিছু অসুন্দর, অশিব, মিথ্যা আত্ম-অভিমান, যা কিছু অকল্যাণকর। ক্ষাত্ররাজ আর বৈশ্য বিষধরের বিষস্পর্শ এই সুন্দর ভুবনকে করছে মারী-ধ্বংসস্তূপের এক মহাশ্মশান।—সহসা এই সুন্দর ধ্যান ভেঙ্গে যায় তাঁর। একান্ত সচিব এসে বলে,—প্রভু, নিদারুণ দুঃসংবাদ এনেছে গুপ্তচর! মহেন্দ্র পর্বত অঞ্চলে রামচন্দ্র সৈন্যসমাবেশ করেছেন। অগণিত সৈন্যের সুবিশাল বাহিনী। ত্রিভুবনের সমস্ত রাজা বল ; আর সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছে তাঁকে। বিপুল সেই সমর সজ্জা। ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশি, কোশল, মগধ, পুণ্ড্র, অঙ্গ এমন কি দেবগণও সর্বশক্তি দিয়ে শক্তিশালী করেছেন রামচন্দ্রকে। যবদ্বীপ, রৌপ্যদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ, সমদ্বীপবাসী রাজাগণও রামচন্দ্রের সহায়। সীতা উদ্ধারের জন্য ত্রিভুবনের সমস্ত ব্রাহ্মণ শক্তি, ক্ষাত্র শক্তি, বৈশ্য শক্তি আপনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান।

একটা দারুণ দুশ্চিন্তা ঘনিভূত হয়ে আসে রাবণের বদন মণ্ডলে। প্রস্তর-শিখর সম নিশ্চল নিপে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ।—বুঝেছি, মহাসিন্ধু শঙ্খে আজ ধ্বনিত হচ্ছে অভিশাপ-আগমনী। সীতা উদ্ধার শুধু বাচনিক। তাদের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আমি জানি। তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু পীড়ন ভীরু দুর্বল প্রজাপুঞ্জ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারত, বহ্নি আকর্ষণের মন্ত্রতেজে যদি তারা ভীষণ ব্যাকুল হত, তাহলে পাপিষ্ঠ ঐ অত্যাচারীর দল বুঝতে পারত নিপীড়িত নিখিলের শোনিত কি ভীষণ উষ্ণ। মুহূর্ত-মধ্যে নিষিদ্ধের নিরুদ্ধ দুয়ার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু হায়, আমার সেই মহাব্রত বুঝি উদ্‌যাপন করতে পারলাম না! জীবনে সব চাইতে ক্ষতি হয়ে গেল বুঝিবা!

সহসা যেন মহাসিন্ধুর নাগ-নাগিনীরা আছড়ে পড়তে থাকে রাবণের বুকে। তাঁর হৃৎপিণ্ডে মহা আক্রোশে যেন গর্জে ওঠে গরুড়।
—যাও সচিব, সংস্থাগারে জরুরী গণ-সন্নিপাত আহ্বান কর।

সেদিন সংস্থাগারের বক্ষকোষ্ঠকও পূর্ণ হয়ে গেছে গণ-সমাবেশে। রুদ্ধশ্বাসে সকলে তাকিয়ে আছে রাবণের দিকে। ক্রোধে বজ্রবায়ু দন্তে দন্তে পিষ্ট করে রাবণ বলেন,—আমার প্রিয় লঙ্কাবাসীগণ!—সভাকক্ষ

উৎকর্ণে নীরব।-আপনাদের প্রিয় লঙ্কা, আপনাদের স্বর্ণলঙ্কা,আপনাদের স্বর্গ-সুখ, আপনাদের স্বাধীনতা আজ লুণ্ঠিত হতে চলেছে। এক দুরন্ত দস্যু, যার নাম 'রাজতন্ত্র', আপনাদের জননী জন্মভূমিকে উদ্যত অস্ত্রে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছে।—নীরব ক্ষুব্ধগর্জনে কক্ষ-বক্ষ আন্দোলিত হয়।—অযোধ্যার নির্বাসিত রাজকুমার রামচন্দ্র মহেন্দ্রপর্বতের পাদদেশে সৈন্য সমাবেশ করেছে। তার ঘোষিত উদ্দেশ্য সীতা উদ্ধার। তা শুধু বাচনিক মাত্র জানবেন। শুধুমাত্র সীতা উদ্ধারের কারণে ত্রিভুবনের সমস্ত শক্তি সংহত হতে পারে না। তাদের মূল লক্ষ্য, আমার গণপ্রজাতন্ত্র বিধানের নিধন।—কক্ষে উত্তেজনা।—প্রতারণাসিদ্ধ তাদের হিংস্র কুটিল বদন-মণ্ডল মিথ্যা প্রচার বা অপভাষণে বিকৃত হয় না। সমস্ত নিষাদভূমি বিপর্যস্ত করে তাদের কুটিল ভুজঙ্গ-মন উদ্যত অস্ত্রে রাক্ষসভূমি উৎসাদিত করতে অগ্রসর হয়েছে। সুহৃদ্‌গণ! সংকট কাল উপস্থিত হলে প্রিয়-অপ্রিয়, লাভ-অলাভ, হিত-অহিত সকলই আপনাদের জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। আপনারা মন্ত্রণা করে যে কার্য আরম্ভ করবেন তা কখনও বিফল হবে না। আপনাদের যত্নেই লঙ্কা সমৃদ্ধ হয়েছে। এ শঙ্কট আপনাদের লঙ্কার সঙ্কট। আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করুন। যে মন্ত্রণায় সকলে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহাই সর্বোত্তম। যাতে প্রথম মতভেদ পরে ঐক্যবদ্ধ হয় তা মধ্যম। আর যদি সকলেই পৃথক পৃথক বুদ্ধিতে চালিত হন পরিশেষে ঐক্যবদ্ধ হলেও তা শ্রেয়স্কর হতে পারে না।

কম্পন জর্জ্জর ধারিত্রীর মুখে যেন জেগে ওঠে অগ্নিস্রাবী জ্বলন্ত প্রলাপ। ক্রোধে গণসংস্থাগারের প্রাচীর যেন কাঁপতে থাকে। কাঁপতে থাকে নগরদ্বারের লৌহ কপাট। প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, বজ্রদংষ্ট্রা কুম্ভকর্ণ, নিকুম্ভ, বজ্রধনু, ইন্দ্রজিৎ সকল রক্ষোবীরের খর নেত্রের বিচ্ছুরিত ক্রোধ যেন এই মুহূর্তে লক্ষ প্রজ্বলন্ত উল্কার জ্বালা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় শত্রুর উপর। সারা লঙ্কা যেন ব্যস্ত হয়ে উঠতে চায় আয়ুধ সন্ধানে।

সহসা মাধ্বী-বারুণী পূর্ণ পাত্রে যেন নীল গরলের বুদ্বুদ ভেসে ওঠে। শোনা যায় বিভীষণের কণ্ঠ। সভাগৃহ হয়ে ওঠে চঞ্চল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বিভীষণের দিকে তাকান রাবণ। সভাগৃহের প্রান্তদেশ থেকে বিভীষণ বলে ওঠেন,—জ্যেষ্ঠ! সীতা তীর্থ-বিষধরী ভুজঙ্গী। কেন তাঁকে তুমি লঙ্কায় এনেছ? তোমারই পাপকার্যের পরিণামে সমস্ত লঙ্কা ধ্বংস হবে। তোমার কামাচারের জন্যই সমস্ত রাক্ষসকুল ধ্বংস হবে। কাল বিলম্ব না করে সবিনয়ে মার্জনা ভিক্ষা করে সীতাকে রাঘবের হস্তে প্রত্যার্পণ কর। যারা আস্ফালন করে তোমাকে সমর্থন করছে তারা যুদ্ধে মুহূর্তকাল রামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে পারবে না। তুমি যদি সবিতা বা মরুদ্‌গণের শরণাপন্ন হও, ইন্দ্র বা যমের কোলেও আশ্রয় নেও, আকাশে বা পাতালে প্রবিষ্ট হও, তথাপি রামের হাত থেকে নিস্তার পাবে না। অধার্মিকের যেমন স্বর্গলাভ হয় না সেইরূপ তোমারও কোন অভিষ্ট পূর্ণ হবে না। রামকে বধ করা তোমার আমার বা অন্য কোন রাক্ষসের সাধ্য নয়। রামের তীক্ষ্ণবাণ তোমাদের কারও দেহে এখনও প্রবিষ্ট হয় নি তাই তোমরা গর্বিত বোধ করছ। ভীম-পরাক্রম সহস্রশীর্ষ নাগ তোমাকে বেষ্টন করেছে দশানন। তোমার বিকৃত বুদ্ধি তোমাকে রাঘব সাগরে নিমজ্জিত করছে। তোমার সুহৃদ্‌গণ, তোমার কেশাগ্র ধরে তোমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে।

শুনে দীপ্ত রোষে জ্বলে ওঠে ইন্দ্রজিৎ,—এই সমূহ আপৎকালে আপনার বাক্য অর্থহীন ও ক্লীবত্বাশ্রিত। রাক্ষস কুলোদ্ভবও যে নয় সেও এমন কলুষবাক্য বলতে পারে না। আপনার উদ্দেশ্য, অন্যের মনে ক্লীবত্ব ও ভয়ের সঞ্চার করা। আপনার মনে কি উদ্দেশ্য নিহিত আছে তা আপনিই মাত্র উপলব্ধি করতে সক্ষম। পঞ্চমুখে শত্রুর প্রশংসা কে করে তা আপনি ভালই জানেন।

—বৎস তুমি অল্পবুদ্ধি বালক, তাই আত্মনাশকর অর্থহীন প্রলাপে তোমার দ্বিধা নেই। যে তোমাকে এই মন্ত্রণা সভায় স্থান

দিয়েছে সেও তোমার ন্যায়ই অল্পবুদ্ধি ও হঠকারী। তোমরা উভয়েই বিনষ্ট হবে।

রাবণের চক্ষুতে যুগপৎ ফুটে ওঠে স্নেহ, ক্রোধ ও বিস্ময়। দীর্ঘক্ষণ সেই দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন বিভীষণের দিকে।—বিভীষণ!—কণ্ঠে স্নেহ বেদনার রোল।—আজন্ম পিতৃস্নেহ বঞ্চিত কনিষ্ঠ তুমি আমারই স্নেহে পালিত। আজন্ম তুমি কি আমাকে এই বিচার করেছ? সিংহাসনের লোভ কি এতই নিষ্ঠুর, এতই হীন! বিভীষণ! দশাননের বিংশতি চক্ষুকে প্রতারিত করা সম্ভব নয়। তোমার বিরুদ্ধে শত অভিযোগ আমার ভ্রাতৃস্নেহ উপেক্ষা করেছে। স্ত্রী-পুত্রকেও তিরস্কার করেছি। কিন্তু আজ সকলই সত্য বলে মনে হয়। বিভীষণ, আমার কোন যুদ্ধে তুমি সঙ্গী হওনি, কোন বিজয়োৎসবে তুমি অংশ গ্রহণ করনি। শূর্পণখার লাঞ্ছনায় তুমি ছিলে নীরব। আর আজ সীতার দুঃখে তুমি বিগলিত হৃদয়, নীতি বচনে মুখর। এ সবই কি অর্থহীন? ইন্দ্রাদি দেবগণের সাথে তোমার গোপন যোগাযোগ, রাম আর হনুমন্তের সাথে সহৃদয় আলোচনা কি আমার অজ্ঞাত বিভীষণ? ভ্রাতৃস্নেহের চাইতেও লঙ্কার সিংহাসন কি এতই মধুর, এতই মহার্ঘ? তোমার আদর্শ পুরুষ রামানুজ লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে দেখ। তোমাকে আমি জানি বিভীষণ, তথাপি আমার স্নেহ তোমাকে ত্রিভুবনের চক্ষুর অন্তরালে রেখেছিল। আমি জানি তুমি রাজা হতে চাও আর আমি রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ চাই। রামের পথই তোমার পথ। রামের পক্ষই তোমার পক্ষ। তোমার পথ বিশ্বাস ঘাতকতার পথ। শত্রু বা ক্রুর সর্পের সঙ্গেও বাস করা ভাল, কিন্তু শত্রুর পক্ষপাতী মিত্র নামধারীর সঙ্গে বাস করা বিপজ্জনক। জ্ঞাতির স্বভাব আমার জ্ঞাত। এক জ্ঞাতি অপর জ্ঞাতির বিপদে হৃষ্ট হয়। বংশের যে প্রধান এবং সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ তার অপমান ও পরাভবের চেষ্টা করে। পাশধারী মানুষদের দেখে পদ্মবনের হস্তিরা বলেছিল-অগ্নি, অস্ত্রশস্ত্র বা পাশ আমদের পক্ষে ভয়ের কারণ নয়, ঘোর স্বার্থপর জ্ঞাতিরাই আমাদের ভয়ের কারণ। তারা খাদ্যের লোভে মানুষের

বশবর্তী হয়ে বনহস্তীদের বন্ধনে সাহায্য করে।—স্মিত হাস্যে ব্যাঙ্গ দৃষ্টিতে বিভীষণের দিকে তাকালেন রাবণ।

অবনত শিরে গদাহস্তে পার্শ্বচরদের নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বিভীষণ! রাবণের কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ,—যাও বিভীষণ, রাঘব তোমারই জন্য প্রতীক্ষা করছেন। তবে জেনে যাও—রাক্ষসের দেহে কণিকাবিন্দু রক্ত থাকতে লঙ্কাকে পরপদানত হতে দেব না। যুগ যুগ ধরে আমি বেঁচে থাকব নির্যাতীতের হৃদয়ে, আর তুমি অমর হয়ে থাকবে বিশ্বাসঘাতক হয়ে।

ধ্যান ভঙ্গে মহাকাল রক্ত আঁখির আশীর্বাদ দিলেন লঙ্কার ললাটে। ধরিত্রীর বক্ষে জেগে ওঠে আবার ভয়ার্তা এক শিশুর ক্রন্দন। আবার সেই মড়ক দুর্ভিক্ষ মহামারী সর্বনাশ! আবার সেই প্রভু ভৃত্য আর আজ্ঞাবহ দাস, অত্যাচার উৎপীড়ণ, ক্ষুধা আর হাহাকার। লোভী ভাগ্যলক্ষ্মী ঐশ্বর্যপাত্র হস্তে এগিয়ে এসেছেন মর্তের ভাগ্য অত্যাচারী প্রতারকের হাতে তুলে দিতে।

বিভীষণের নিরাপদ আগমনে অতি প্রসন্ন হাস্যে সুগ্রীবের দিকে তাকিয়ে রাম বললেন,—সুহৃদ্ সুগ্রীব! রক্তে রণের কোলাহল স্তিমিত হতে দিতে নেই। আমি আদেশ করছি, শত্রুর সমস্ত দুর্বলতাকে সদ্ব্যবহার করে জয় সুনিশ্চিত করতে কাল বিলম্ব না করে লঙ্কা আক্রমন কর। ছলে বলে কৌশলে যুদ্ধ জয়ই আমার সমর নীতি। অন্য কোন নীতি রাঘব মানে না। বিভীষণ আমাদের পরম বন্ধু হয়েছেন আর দ্বিধার কোন কারণ নেই। রাজ্য, জীবন ও সুখের নিশ্চয়তা তিনি পেয়েছেন, সুতরাং বিলম্বেন অলম্।

সপ্তসিন্ধুর কলোচ্ছাসে রাঘব সেনানী সেতু অতিক্রম করে প্রবেশ করতে লাগল লঙ্কায়। সেনানীর লঙ্কায় প্রবেশ নিরাপদ করতে গদাহস্তে লঙ্কায় সেতু মুখ রক্ষা করতে থাকেন ধার্মিক বীর বিভীষণ।

অগনিত বীর সেনানীর পদভারে টলটলায়মান হয়ে ওঠে লঙ্কা। ত্রিভুবনত্রাতা রাঘব প্রবেশ করছেন লঙ্কায়। দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধমহর্ষিগণ উল্লসিত হয়ে ওঠেন। যম ইন্দ্র বরুণ ত্বষ্টাদি স্বর্গাধীপগণ সশঙ্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন লঙ্কার দিকে। ত্রিভুবনের একটা মূর্তিমান অশান্তিকে নির্মূল করতে ভার্গবের কুঠার হস্তে যেন এগিয়েছেন রাম। একটা নিদারুণ সংহারের বাদিত্র নিঃস্বন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতে থাকে। সপ্তস্বর্গ-পাতালের সকল বিঘ্নের সর্বনাশ করতে এগিয়েছেন তিনি।

অকস্মাৎ একটা প্রজ্জ্বলিত দাবানল যেন ছড়িয়ে পড়তে থাকে লঙ্কার দেহে। আক্রমনের আকস্মিকতায় চমকে ওঠেন দশানন। মুহূর্তপরে স্বাভাবিক স্বগত হাস্যে বলেন,—মূঢ়, আমাকে আবদ্ধ করতে সপ্ত আকাশে কি জটিল জালই না বিস্তার করেছ, কিন্তু, জান না আমি তোমাদের ভাগ্যাকাশে একটা ধুমকেতু। তোমাদের সমস্ত জাল ছিন্ন করে তোমাদের নিক্ষেপ করব মহাকালের সর্বনাশের কক্ষবলয়ে।

মুহূর্তে যেন গর্জে ওঠে সারা লঙ্কার প্রাণ। দারুণ একটা আক্রোশের অগ্নিবাষ্প আছড়ে পড়তে থাকে রামচন্দ্রের উপর। গৃহস্তের অঙ্গনে যেন প্রবেশ করেছে দস্যু। বিষবাণ হস্তে যেন ব্যাধ প্রবেশ করেছে মৃগেন্দ্র-গুহায়।—পাপিষ্ঠ রাঘব, তুমি আকাশে দেখেছ উত্তর ফাল্গুনী আর হস্তা, দেখনি উল্কা। জল-নলিনীর শিতল শান্তি পেয়েছ, পাওনি জলদর্চির জ্বালা। বৈশ্বানরের প্রমোদ ভবনে এসেছ কোমল-গান্ধারের আশায়।

লঙ্কার হৃদয় থেকে উৎসারিত হতে থাকে ক্রোধগর্জন। আয়ুধ, আয়ুধ, শুধু আয়ুধ ধ্বনিতে প্রপুরিত হয়ে যায় লঙ্কার আকাশ। বাতাসে ধ্বনিত হয় সংহারের বার্তা। মরণের যজ্ঞবেদীতে আত্মাহুতি দিতে মুহূর্তে যেন প্রস্তুত হয়ে যায় সারা লঙ্কার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। বিস্ময়ে বিশ্ব তাকিয়ে দেখছে দস্যুর উদ্যত নখর চূর্ণ করে দিতে মাতৃভূমির মুক্তি যজ্ঞে মৃত্যুকে ভৃত্য জ্ঞান করছে সারা লঙ্কা। নিমীলিত নেত্রে ব্রহ্মা যেন বলতে চাইছেন—মর্তবাসীগণ দেখ এইখানেই রাবণের বিশেষত্ব। নীতি - ভাষ্যে পরাজিত হয়েছ তোমরা। দৈহিক জয়ই বড় জয় নয়, নৈতিক জয়ই বড় জয়।

মৃত্যুভয়হীন অসি বর্মধারী রক্ষোযুবার পার্শ্বে মূর্তিমতী প্রেরণার মত উদ্ধত প্রগল্‌ভে উদ্যত অস্ত্রে এগিয়ে আসছে নারী। শিশুরা নেচে উঠেছে মাতৃক্রোড়ে রণতূর্য নাদে। বৃদ্ধের মুষ্টিবদ্ধ অসি আন্দোলিত হয় আকাশে। দুর্জয় এক প্রতিজ্ঞায় গর্জে ওঠে, হল হস্তে হলধর, সীতা হস্তে কৃষাণী। লঙ্কার দিকে দিকে শোনা যায় একটা গণপ্রলয়ের

নিনাদ। ক্রুদ্ধ গর্জনে গর্জিত সাগর-তরঙ্গ যেন রাঘব সেনা গ্রাস করতে বারংবার এসে আছড়ে পড়ছে লঙ্কার মাটিতে। শুভ্র ফেন-পুঞ্জ মাঝে যেন জ্বলছে বারবানল।

ভয় পেয়ে যায় রামসেনা। পূর্বে-পশ্চিমে, দক্ষিণে কি বামে তাঁরা যেন দেখতে পায় শুধু মৃত্যু বিভীষিকা। বারংবার তারা দৃষ্টি রাখে সেতু মুখের দিকে। রাঘবের বদনে ফুটে ওঠে এক গভীর দুশ্চিন্তার মসিরেখা।—এ এক অভাবনীয় অভূতপূর্ব প্রতিরোধ। দুর্ভেদ্য গণপ্রতিরোধ। সারা রাজ্যের সমস্ত মানুষই যেন যুদ্ধের সৈন্য। দেখে বিস্মিত হন রাঘব।—ভেবেছিলাম অতর্কিত আক্রমণে জয় হবে অনায়াসলব্ধ। কিন্তু এই গণদুর্গ যেন দুর্ভেদ্য। যদি পাপিষ্ঠ দশাননকে সময় ও সুযোগ দেওয়া হত তবে অবশ্যই সে ত্রিভুবনে এমনই একটা গণশাসনের দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করত।

অকস্মাৎ ত্রিদশায়ুধ নির্ঘোষের মত লঙ্কার আকাশে বেজে ওঠে মহাপ্রলয়ঙ্কর রণডঙ্কা। মরণ আলিঙ্গনে মেতে ওঠে সৈন্যদল। রণস্থল প্রকম্পিত করে দলিত অঞ্জন-কান্তি রক্তলোচন ইন্দ্রজিৎ বারংবার শত্রুকে আহ্বান করে রণে।—পরাস্বপহারি পাপিষ্ঠ প্রতারকের দল, সাধ্য থাকে প্রতিরোধ কর আমার ভীম-ভৈরব আক্রমণ। কোথায় তোদের পরমপিতা রাম, কোথায় বিশ্বাসঘাতক সর্পখল-অন্তর বিভীষণ। সাধ্য থাকে রণাঙ্গনে মন্মথ উন্মাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াক তাঁরা।—সারা রণাঙ্গন দলিত-মথিত করে অগ্নিময় সন্ত্রাসে উন্মাদ উল্লম্ফনে প্রভঞ্জনের বেগে যেন চলেছে ইন্দ্রজিতের রণরথ। রাঘব সেনানী সারা রণাঙ্গনে দেখতে পায় শুধু দারুণ অগ্নিজ্বালার বিভীষিকা। ত্রাসতাড়িত সেনানী খোজে পলায়নের পথ। আহত মুমূর্ষুর আর্ত-চীৎকারে ক্লান্ত বিবর্ণ হয়ে ওঠে লঙ্কার আকাশ। রণাঙ্গনে কৃতান্তসম ইন্দ্রজিৎ নল-নীল-অঙ্গদ-হনুমান বীরগণকে শরাহত করে বিজয়গর্বে অন্বেষণ করতে থাকেন—কোথায় সেই জাতিদ্রোহী, সিংহাসন লোভী বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ। মুষিক বিবর থেকে আত্মপ্রকাশ কর।

রণোন্মাদ মেঘনাদের প্রলয়ঙ্কর মূর্তি দেখে শিহরিত হয়ে ওঠেন রাম-লক্ষ্মণ। তাঁদের অন্তরে যেন ধ্বনিত হয় একটা অসম্ভবের বার্তা। লঙ্কার প্রাসাদ নিকেতনের গর্ব হরণ করা বুঝি সম্ভব নয়।

সহসা এক নিদারুণ আর্তবিলাপের রোল ওঠে রামের কণ্ঠ হতে। সহস্র ফণা বিস্তার করে বাসুকী যেন আঘাত করেছে লক্ষ্মণকে। নাগ-পাশবদ্ধ লক্ষ্মণকে দেখে বিভীষণ আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন,—সর্বনাশ তার কুটিল পক্ষ বিস্তার করে আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। ত্রিভুবনে এমন কোন স্থান আর থাকবে না যে স্থানে আমি আশ্রয় নিতে পারব। হায় রাঘব, রাবণের সংকল্পই বুঝি সিদ্ধ হল।

প্রাসাদ শীর্ষে মঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্বিত বক্ষে রণাঙ্গন পরিদর্শন করেন রাবণ। আবার একটা সুপ্ত বেদনার চিহ্নও যেন ভেসে ওঠে তাঁর দৃষ্টির গভীরে।—এই রণে আত্মাহুতির কি স্বার্থকতা আছে ঐ অর্বাচীন রাঘব সেনামণ্ডলীর! সীতাও পাবে না, স্বাধীনতাও পাবে না, সুখও পাবে না। পাবে শুধু নিজ গৃহ-সীতার অশ্রু, দাসত্বের শৃঙ্খল আর দুঃখ!

ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে মিলিয়ে যায় সন্ধ্যাসূর্যের রাগ-রেখা।

স্তব্ধ রণাঙ্গনে ঘনিয়ে আসে নিশার অন্ধকার। বিভীষণ তাঁর ওষ্ঠ সন্ধিতে নীরব কুটিল হাস্যের সঞ্চার করে বলেন,—ভগবন রামচন্দ্র, ইন্দ্রজিৎ দুর্জয় হলেও অজেয় নয়।

—রাবণানুজ, আপনারই আনুকূল্যে লঙ্কা জয় করব। এ কর্তব্যও আপনারই।

—এ দুষ্কর কার্য-সাধনে ত্রিভুবনে অপযশের লজ্জা উপেক্ষা করতে হবে।

—আমার ঘোষিত যুদ্ধনীতি, ছলে-বলে-কৌশলে জয় করায়ত্ব করা।

—ভগবন, নির্জন নিকুম্ভিলা বনে অস্ত্রানুশীলনের একান্ত সাধনায় রত ইন্দ্রজিৎ থাকে অরক্ষিত আর সাধনায় নিবিষ্ট চিত্ত। মেঘনাদ নিধনের সেই একমাত্র সুযোগ, অন্যথায় সে অপরাজেয়। সে স্থানেও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া চাই বীর।

—উত্তম, বীর লক্ষ্মণ এ মহৎ কার্য সাধন করবে।

—কিন্তু তারপর দশানন প্রলয় ঘটাবে। সে জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। শাবক-হারা সিংহীর মত অতি ভয়ঙ্কর হবে সে।

পর প্রভাতে হঠাৎ নির্জন নিকুম্ভিলা বনাঞ্চলও এক তপ্ত বায়ু-প্রবাহে কেঁপে ওঠে। শান্ত বনভূমির নীরবতা মথিত করে মত্তকণ্ঠের উল্লাস শুনতে পান ইন্দ্রজিৎ। পত্রমর্মরে ধ্বনিত হয় আক্রমণের বার্তা। বিস্মিত হন তিনি। যজ্ঞভূমি ছেড়ে চলে আসেন বাইরে। দেখেন, সত্যই কাপুরুষের মত তাঁকে আক্রমণ করেছে রামানুজ লক্ষ্মণ। আহত শার্দ্দুলের মত ভীমবেগে আক্রমণ করেন তিনি লক্ষ্মণকে। সে আক্রমণ সহ্য করতে পারেন না লক্ষ্মণ। এক সর্বনাশের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে তিনি, ভীত ও সন্ত্রস্তের মত সাহায্য প্রার্থনা করেন অলক্ষ্যের দেবতাদের কাছে। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অলক্ষ্য থেকে সাহায্য করেন লক্ষ্মণকে।

শত শরে আহত তপস্বী মেঘনাদের দেহ লুটিয়ে পড়ে ভূতলে। ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যায় তাঁর হৃৎস্পন্দন। বিজয়গর্বে ফিরে আসেন লক্ষ্মণ।

শোকার্তের রোল ওঠে লঙ্কার প্রাসাদে। প্রাসাদ শীর্ষ থেকে চরম রণ-ডঙ্কা বাজিয়ে দেন দশানন। একটা মহারণের ঘূর্ণাবর্ত যেন আছড়ে পড়ল লঙ্কার প্রাসাদে।—হায় ইন্দ্রজিৎ, হায় ইন্দ্রজিৎ বলে উন্মাদিনীর মত চীৎকার করতে করতে মন্দোদরী আয়ুধ সন্ধানে প্রবেশ করেন অস্ত্রাগারে। দিব্যাস্ত্র সন্ধানে শূর্পণখা দ্রুত ধেয়ে চলেন অস্ত্রাগার অভিমুখে। বীরাঙ্গনা প্রমীলা অতি ধীর-সগম্ভীরে অশ্বা-রোহনে চলে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পতির পরিত্যক্ত অস্ত্রের সন্ধানে।

শঙ্কিত হয়ে ওঠেন রাম। বিশ্বাস করতে পারেন না, কোনদিন ভাবতেও পারেন নি,—দুর্বলা নারী এত ভয়ঙ্করী হতে পারে। রাক্ষস রমণী, আর্য-রমণীদের মত শুধু কোমল ভোগের বস্তুই নয়, প্রয়োজনে তাঁরা অতি ভয়ানকও হতে পারে। শূর্পণখার রণ-রঙ্গিনী রূপ দেখে সন্ত্রস্ত ও বিচলিত বোধ করেন রাম।—বুঝিবা এক ভয়ঙ্কর

প্রতিশোধের সুযোগ গ্রহণ করবে ঐ বীরাঙ্গনা শূর্পণখা।

হঠাৎ সন্ত্রস্তের মত চমকে ওঠেন রাম। দেখতে পান, অনল যেন তাঁর মহাবিধ্বংসী প্রজ্জ্বলন্ত সহস্রশিখা বিস্তার করে গলিত অনল উদ্‌গীড়ন করতে করতে প্রবেশ করেছে রণাঙ্গনে। রাম সেনানীকে দুর্বল পশুর মত দলিত মথিত করে শত্রু নায়কের সন্ধানে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলছে রণাঙ্গনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দশানন। তাঁর বাণমুখ থেকে মুহুর্মুহু উদ্‌গীড়িত হচ্ছে জ্বালানল। ত্রিভুবনের সমস্ত ব্যূহিত শক্তি বিধ্বস্ত ও লণ্ড-ভণ্ড করে রণাঙ্গনে বিজয়ীর ন্যায় বিচরণ করতে করতে মুহুর্মূহু বজ্রনির্ঘোষে তিনি বলতে থাকেন,—আমি প্রলয় সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত বাণে পাপিষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণের প্রাণান্ত ঘটাব। আমি কালাগ্নি। আমি পুত্রহন্তার মুর্তিমান সমন। তাঁদের শোণিতে আমি আজ ত্রিভুবনের শান্তি তর্পণ করব।

মুহুর্মূহু প্রচণ্ড জ্যানির্ঘোষ, রৌদ্রাস্ত্র, গন্ধর্বাস্ত্র, সৌবাস্ত্র, শূল, গদা-পাশ-অশনি, অস্ত্রে অস্ত্রে আকাশ প্রপুরিত হয়ে গেল। মনে হয় লঙ্কার আকাশ থেকে বায়ু যেন পলায়ন করেছে। এক মহাধ্বংসের যন্ত্রণায় পৃথিবী যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আচম্বিতে লক্ষ্মণের বক্ষ লক্ষ্য করে অষ্টঘন্টি শক্তি শেল নিক্ষেপ করেন রাবণ। অব্যর্থ সেই আঘাত। ঝঞ্ঝাঘাত তরুর ন্যায় ভূতলে লুটিয়ে পড়ে লক্ষ্মণের দেহ।—নরাধম, দেখি ত্রিভুবনে এমন কোন শক্তি আছে তোকে এই শেলাঘাত থেকে রক্ষা করে।—বলে উন্মাদের মত অট্টহাস্যে রণাঙ্গন কাঁপিয়ে তোলেন রাবণ।

একটা দারুণ হাহাকার ওঠে রাম সেনার মধ্যে। তাঁরা ভীত, সন্ত্রস্ত, মুহ্যমান। সেনাপতি জম্বুবান বলে ওঠেন,—সত্যই অসাধারণ এই রাবণ। একাকী রাবণ ত্রিভুবনের সমস্ত বীরদের অতিক্রম করতে সক্ষম। রাবণ মহাবীর, অমিত শক্তিধর, অজেয়। এ হেন যোদ্ধা দর্শনে আমি ভাগ্যবান। আমাদের বাণ, বর্শা, খড়্গ, পরিঘ সকল অস্ত্র তাঁর কাছে ব্যর্থ। সে সর্বাস্ত্রধর।

লক্ষ্মণকে বক্ষে ধারণ করে রামচন্দ্রের আর্তনাদের ভাষা বায়ুতাড়িত ঝটিকা বিলাপের মত ছড়িয়ে পরে ত্রিভুবনে। আর বিলম্ব করেন না হনুমান। দুর্লভ বিশল্যকরণী সংগ্রহ করে শঙ্কা মুক্ত করেন লক্ষ্মণের জীবন।

কিন্তু, আদর্শের এই সংঘাতে আদর্শনিষ্ঠ রাবণ একাকী যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত করে তোলেন। ত্রিভুবনের কায়েমী স্বার্থবাদের বদনে ফুটে ওঠে একটা গভীর বিষণ্ণতা। ঋষি-মহর্ষিগণ রামচন্দ্রের জয় কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করতে থাকেন। মহর্ষি অগস্ত্য বহুতর দিব্যাস্ত্রাদি সংগ্রহ করে সরবরাহ করতে স্বয়ং আসেন রণস্থলে। ইন্দ্রসারথি মাতলী এসে বলেন,—কাকুৎস্থ সহস্রাক্ষ ইন্দ্র আপনার বিজয় কামনা করে রথ, মহাধনু, শর, কবচ ও শক্তি পাঠিয়েছেন। আপনি গ্রহণ করে জয়ী হোন। আপনার জয়-পরাজয়ের উপর ত্রিভুবনের সকল সিংহাসনের নিরাপত্তা নির্ভর করছে।

ভগবান আদিত্য এসে বলেন,—রাঘব, তুমি রাবণ বধে ত্বরান্বিত হও। আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। দিকে দিকে প্রজাচেতনার দুর্লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।

দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ রামের জয় কামনায় হোমার্চনাদি আরম্ভ করেন। তথাপি ত্রিভুবন বিষাদ ও শঙ্কায় লক্ষ্য করতে থাকে রাবণ একাকী সকল শক্তি প্রতিহত করে জয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছে। দ্বৈরথ সমরে, ইন্দ্রদত্ত রামচন্দ্রের রথধ্বজ, দশানন নিক্ষিপ্ত অস্ত্র পক্ষীর মত চঞ্চু প্রহারে ক্ষিপ্র বেগে হরণ করে নিয়ে চলে গেল।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে রাবণ যেন আরও দুর্মদ হয়ে উঠল। ক্রমেই রণাঙ্গনের দৃশ্য বীভৎস হয়ে উঠল। অর্দ্ধমৃত, ছিন্নহস্ত, ভগ্নপদ, তীরবিদ্ধ সেনানীর আর্ত-চীৎকারে আকাশ বায়ু যেন কেঁদে উঠল। পুরীশীর্ষ থেকে, ত্রিকূট শিখর থেকে রাক্ষস রমণীগণ অবিরাম অগ্নি গোলক নিক্ষেপ করতে থাকে রাঘব সৈন্যদের লক্ষ্য করে। শূর্পণখা, প্রমীলা অশ্বারোহণে রণাঙ্গনের সীমান্তে ভয়ানক ত্রাসের সঞ্চার করতে থাকে। ত্রিভুবনের জনমণ্ডলী স্তব্ধ বিস্ময়ে

অবলোকন করতে থাকে লঙ্কার রাক্ষস রমণীদের বীরাঙ্গনা রূপ। শূর্পণখার সেই ভীম-ভৈরবীরূপ দেখে শঙ্কিত ও বিস্মিত না হয়ে পারে না রাম-লক্ষ্মণ। ভাবেন—এই কি জনস্থানের সেই শূর্পণখা! কি ভীষণ।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে। স্তব্ধ হয়ে আসে রণাঙ্গন। শুধু আহত আর মুমূর্ষু সৈন্যের আর্ত-ক্রন্দনে ভরে ওঠে সন্ধ্যার আকাশবায়ু। জল জল চীৎকার শুনা যায়। শুনা যায় মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে আহত সৈন্যের জীবন ভিক্ষার বিলাপ। অগ্নিদগ্ধ সৈন্যের একটু শীতল-শান্তি প্রলেপের আর্ত-চীৎকার। শিবা আর শকুনীর উল্লাস রব। অর্দ্ধমৃত অশক্ত সৈন্যের জীবন্ত দেহ থেকে মাংস ছিন্ন করে অনন্দোল্লাসে ভক্ষণ করছে তারা। বীভৎস, অতি বীভৎস সেই দৃশ্য।

সৈন্য শূন্য নির্জন রণাঙ্গনের দিকে নির্নিমেশ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে পাষাণী-ভূত বিটপীর মত স্তব্ধ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাবণ। নিথর তাঁর আঁখি পত্র। সম্মুখে দেখছে শুধু মৃতের স্তূপ, আর শুনছে শুধু শমন-সদন যাত্রীর আর্ত ক্রন্দন। তৃষ্ণা কাতরে কেহবা জীবনের শেষ জল যাচ্ঞা করছে। অগ্নিদগ্ধ কেহ বা যাচ্ঞা করছে সামান্য শন্তি সুখের প্রলেপ। সামান্য বেঁচে থাকার জন্য কেহ বা করছে ক্রন্দন। কাতর কণ্ঠে কেহ বা স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের উদ্দেশ্যে করছে বিলাপ।—মনে পড়ে যায় তাঁর নরকের সেই বীভৎস দৃশ্য।—কাঁদের স্বার্থে,কাঁদের সুখ-স্বর্গ রচনা করতে প্রাণ দিল চিরদুঃখী এই প্রজাপুঞ্জ? দুঃখ হয়, এ রণের রহস্য আজও তাঁরা ভেদ করতে সক্ষম হল না!

সহসা ভেবে কেঁপে ওঠে তার হৃদপিণ্ড—আমারই অস্ত্র প্রহরণেই তো রণাঙ্গনের ঐ বীভৎসতা। কিন্তু,···এই প্রতারণার জ্বালানলে নীরবে আত্মোৎসর্গ করাই কি বাঞ্ছনীয় হত? না, সে হত মহাপাপ। যে প্রজা সাধারণের মঙ্গল কামনা আমার জীবনের ব্রত, তাঁরা যদি এ সত্য উপলব্ধি না করে প্রতারিত হয় আমি তা ক্ষমা করতে পারি না। না, এ আমার ক্রোধজ্বালা নয়, অবহেলা নয়, অহংকারও নয়,

এ আমার অসম্পূর্ণ ব্রতের দুঃসহ ব্যর্থতার জ্বালা। কিন্তু আমি আজ বড় একা, বড় অসহায়—পুত্র-পৌত্র, আত্মীয়-পরিজন, শুভানুধ্যায়ী বীরবৃন্দ সকলেই রণাঙ্গনে শায়িত। বিজয়োল্লাস করবারও আর কেহ বাকী নেই, বাকী শুধু আমি একা।—অন্তর্মথিত ক্রন্দনের রোল ওঠে তাঁর হৃৎপিণ্ডে। অবসন্ন অন্তরে ধীরে ধীরে ফিরে যান একাকী প্রাসাদে।

অশ্রু গোপন করে বীরাঙ্গনাবেশী মন্দোদরী এসে দাঁড়ান সম্মুখে। নিবিড় বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকান রাবণ। যে কোন তীরস্কারের প্রত্যাশাই করেন তিনি। তীরস্কারই তাঁর প্রাপ্য। ক্রন্দন-কম্পিত ওষ্ঠে মন্দোদরী বলেন,—প্রভু দশানন, এ জয়ের অর্থ কি? প্রভু, আপনি পুরুষ, নির্মম। আপনি পুত্র হারা জননীর অন্তরের বেদনা বুঝতে অক্ষম।

—প্রিয়ে, আমার জীবনে জয়-পরাজয়ের মানদণ্ড নির্নিত হয়ে গেছে।—কথা কয়টি যেন দূরান্তের বনস্থলীর হৃদয় বিদীর্ণ করে নির্গত হওয়া একটা অস্ফুট ক্রন্দন-ধ্বনি। যেন এক দুঃসহ বেদনা ক্রন্দনের শব্দ হারা উচ্ছ্বাস। যেন এক অব্যক্ত বিলাপ।—মানব জীবনের সত্য বুঝতে আমি ভুল করি নি মন্দোদরী। সত্যের জন্য তোমার বীর পুত্র প্রাণ দিয়েছে। সত্যের জন্য তোমার পতির প্রাণও হয়ত নিঃশেষ হয়ে যাবে। তথাপি আমি মিথ্যার পদতলে লুণ্ঠিত মস্তক হইনি। এই শান্তনার স্মৃতি নিয়ে তুমি বেঁচে থেকো।—বলে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অবনতশিরে কক্ষ ত্যাগ করে যান দশানন।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যান প্রমীলার কক্ষের নিকটে। আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত বীরঙ্গনা প্রমীলার কণ্ঠে শোক-বেদনা বিড়ম্বিত রোষ-বিলাপে চম্‌কে ওঠেন রাবণ। নিঃশব্দে ফিরে আসেন আপন কক্ষ্যে।

বড় অবসন্ন বোধ করছেন রাবণ। আত্ম-জিজ্ঞাসায় স্বগত অস্ফুট-স্বরে বলতে থাকেন'—দশানন, জীবনে দু'টি মস্তবড় ভুল করেছ তুমি, —সত্য প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব করেছ, আর মানবতা প্রতিষ্ঠার পথে তুমি মানবতার শত্রু ইন্দ্রকে মুক্তি দিয়েছ।

সহসা ক্ষিপ্তের মত পুরী নিস্ক্রান্ত হয়ে দ্রুত ধেয়ে যান অশোক-কাননের দিকে। থমকে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখেন সীতাকে। স্বগতে বলেন,—না সীতা, তুমি পাপিষ্ঠা নও। আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু তোমার কুটিল পতি তোমাকে ক্ষমা করবেন কি না জানি না, জানি না তোমার জীবনে আরও কত দুঃখ আছে—আকাশের চাঁদ তখন পাণ্ডুর হয়ে বিশ্রাম পালঙ্কের দিকে এগিয়ে চলেছেন দ্রুত। কলরব করে উঠেছে নিশা শেষের প্রহর পক্ষী। ফিরে যান দশানন আপন কক্ষে।

*　　　*　　　*

এদিকে রাঘব শিবির গ্রাস করেছে নিদারুণ বিষাদ আর হতাশায়। আজিকার মহারণে রাবণের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে রাঘব সেনানী আতঙ্ক গ্রস্থ ও হতাশ। তাঁরা পলায়নের কথা ভেবে সেতু মুখের কথা ভাবছে। যুদ্ধজয়ে প্রায় নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ছেন রাম-লক্ষ্মণ। দুর্দ্ধর্ষ এই রাবণ বুঝিবা অজেয়।—রামের কণ্ঠে চরম হতাশা।—আমিও যে প্রতিষ্ঠালাভের আশা করছিলাম তা এখন অন্তর্হিত প্রায়। আমি পরাজিত হয়ে ফিরে যাব কোন লজ্জায়। আমি এই লঙ্কার মাটিতে দেহত্যাগ করব। আমি এখন বিপন্ন। আমার রাজ্য জয়ের আশা দূর হয়েছে। রাবণের সংকল্প সিদ্ধ হয়েছে। বানর সেনার শোণিতে রণভূমি পিচ্ছিল হয়ে গেছে। নিহত সেনানীর শোণিত, মেদ, যকৃৎ, দেহ, মস্তক মিলিত হয়ে যেন যম-সাগরগামিনী স্রোতাস্বিনীর সৃষ্টি করেছে। রাবণের পরাক্রম আশ্চর্য। রাবণের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র মনে হয় অচিন্ত্য প্রভাব ভগবান স্বয়ম্ভূর অস্ত্রই যেন আমাদের উপর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তাঁর বাণ-বর্ষণ আমাদের স্থির থাকতে দেয় না। আমাদের বীর যোদ্ধাগণ সকলই তার কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। বারংবার সে জয়শ্রী লাভ করে জয়গর্বে ফিরে যায় প্রাসাদে।

রাম-লক্ষ্মণকে নিশ্চেষ্ট এবং সুগ্রীব-নীল-অঙ্গদাদি বীর সেনা-

পতিগণকে মোহগ্রস্ত দেখে বিভীষণ তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন,—বীরগণ আপনারা মোহ ত্যাগ করুন। অদ্যকার যুদ্ধেই বোধ হয় প্রজ্বলন্ত রাবণের কৃতান্ত শক্তি নিঃশেষিত। আপনারা রণমদে উজ্জ্বল হয়ে উঠুন। আগামীকল্যের যুদ্ধে জয় অবশ্যই আপনাদের করায়ত্ত হবে। আপনারা ভীত হবেন না। রণে ভয় পরাজয়ের কারণ। সংকটকালে হতাশা, সর্বনাশের কারণ হয়। যুদ্ধে সর্বদা জয়লাভ হয় না। আপনারা এখন উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্যদের মনোবল ফিরিয়ে আনুন। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করুন। রাবণের ভয়ে তারা চক্ষু মেলছে না। তারা পলায়নের কথা ভাবছে। এ অত্যন্ত বিপর্যয়ের কারণ হবে।

দুর্বলকণ্ঠে জাম্ববান বলেন,—রাক্ষসরাজ, আপনি তার কনিষ্ঠ হয়েও বোধ হয় জ্যেষ্ঠের পরাক্রম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন নি। রাবণ বোধ হয় অজেয়।

কিঞ্চিৎ রুষ্ট কণ্ঠেই বিভীষণ বলেন,—সুহৃদ্‌বর, আমি সকলই অবগত আছি। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাবণ ব্রহ্মার বরে দেব-দানব-যক্ষ গন্ধর্বাদির অবধ্য হলেও নর-বানরের অবধ্য নয়।

—সত্য বটে রাক্ষসরাজ, কিন্তু ঐ কালান্তক রাবণের সম্মুখে কে কতক্ষণ দণ্ডায়মান থাকতে সক্ষম।

—কিন্তু কপিরাজ, বিস্মৃত হবেন না ত্রিভুবনের সমস্ত রাজশক্তি আর ঋষি-ব্রাহ্মণ জ্ঞানীজনের আশীর্বাদ রয়েছে আপনাদের পশ্চাতে। বিস্মৃত হবেন না, দুষ্টের দমন করে বিপন্ন আর প্রপন্নের রক্ষায় অঙ্গিকারাবদ্ধ ক্ষত্রিয় বীরগণ। রাঘব আমাকে লঙ্কার সিংহাসন প্রদানের অঙ্গিকারে আবদ্ধ। ত্রিভুবনের সমস্ত রাজতন্ত্রের নিরাপত্তা নির্ভর করছে এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর। এই যুদ্ধে রাবণ জয়ী হলে অচিরে ত্রিভুবনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। বিলুপ্ত হবে সকল সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা আর প্রতিপত্তি।

বিভীষণের ভাষণে রাম-লক্ষ্মণের চক্ষুতে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে প্রত্যাশা। অন্তরে নিরন্তর মন্ত্রিত হতে থাকে জয়, জয়। প্রোজ্জ্বল

হয়ে ওঠে আদর্শ রক্ষার প্রতিজ্ঞা।

রাঘব-সেনা শিবিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাবণাতঙ্ক। সহসা সদ্য জাগ্রত বিহগের কাকলীতে শিহরিত হয়ে ওঠে তারা। মন্দিরে মন্দিরে প্রভাতারতির ঘন্টাধ্বনি আনে তাদের মনে মহা আতঙ্ক। চারণের প্রভাতী সঙ্গীতে আনে বিষণ্ণতা। সূর্যোদয়ে সংগ্রামের জন্য অনিচ্ছুক ভীতার্ত অন্তরে প্রস্তুত হতে থাকে তারা।

নবারুণ প্রভায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে রণাঙ্গন। সৈন্য কোলাহলে মিশে যায় সাগরের কোলাহল। ধীরে ধীরে স্পষ্টতর হতে থাকে ত্রিকূট শৈল শিরে লঙ্কার প্রাসাদ শীর্ষ। রাম সেনার দৃষ্টিতে আজ লঙ্কার প্রাসাদ শীর্ষও যেন আতঙ্ক।

নিদারুণ এক সংঘর্ষের শঙ্কায় লঙ্কা যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঋজু বৃক্ষ রাজি সাগরবায়ুর চঞ্চল আঘাতে অনিচ্ছায় আন্দোলিত হচ্ছে। ত্রিভুবনের রাজন্যকুল, ইন্দ্রাদি দেবগণ, ঋষি-মহর্ষিগণ একটা নিদারুন সংবাদের শঙ্কায় উৎকর্ণ প্রতিক্ষায় কাল যাপন করছেন।

রাক্ষস সেনানীর আনন্দোল্লাসে কেঁপে ওঠে সারা লঙ্কা। নবারুন প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দিগ্‌দিগন্ত। মাতা কৈকশীর চিত্রমূর্তির পাদদেশে এসে দাঁড়ান রাবণ। শিশুর মত অশ্রুবিসর্জন করেন। প্রণাম করে ধীরে ধীরে এসে আরোহণ করেন রণ-রথে। পুরী নিষ্ক্রান্ত হয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সারাদিক তাঁকিয়ে দেখেন। সজল নয়নে পুরীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলেন,—হে জননী, বীরপ্রসূনা লঙ্কা, আমাকে বিদায় দিয়ে তুমি কি কাঁদবে না! হে দুর্ভাগিনী, পরপদানত হয়ে তুমি কি সুখী হবে!—অশ্রুমোচন করে রণাঙ্গন অভিমুখে রথ চালনা করতে সারথিকে নির্দেশ দেন।

দিকে দিকে বেজে ওঠে রণবাদ্য। দুর্মদ রণনাদে সাগর তরঙ্গের মত রাক্ষস সেনানী বিজয়োল্লাসে আছড়ে পডতে থাকে শত্রুব্যূহে। রণ-অট্টনাদে স্তব্ধ হয়ে যায় আকাশবায়ু। বিদ্ধস্ত হয় কপি সেনাব্যূহ। পলায়নের কথা ভাবে তাঁরা। ব্যস্ত হয়ে ওঠেন রাম-লক্ষ্মণ আর রক্ষোরাজ বিভীষণ। বজ্রনাদে বীরবাণী ঘোষণা করতে

থাকেন সুগ্রীব হনুমান অঙ্গদাদি বীর সেনাপতিগণ।

রণাঙ্গনে দেখা যায় রাবণের স্বর্ণরথের স্বর্ণ ধ্বজ। উল্লাস ধ্বনিত হয় রক্ষো সেনানীর কণ্ঠে।

দ্রুত রণাঙ্গনের মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ায় রাবণের রথ। উচ্চকিত ব্যস্ত দৃষ্টিতে তাকান রাম-লক্ষ্মণ। সোচ্ছাসে বিভীষণ বলে ওঠেন, —প্রভু রামচন্দ্র, নিবিষ্টে লক্ষ্য করুন, দেখুন রাবণ তেজোহীন, নিষ্প্রভ, ক্লান্ত, যেন মেঘাচ্ছন্ন নিষ্প্রভ তপন। যেন নির্বাপিত যজ্ঞস্থলীর চিহ্নমাত্র।

দেখে সত্যই বিস্মিত হন রাম।—সত্যই রাক্ষসরাজ রাবণ যেন এক তাপদগ্ধ তরু। বিবর্ণ, ক্লান্ত, নিস্তেজ। রথে দণ্ডায়মান যেন রাবণের একটা ছায়ামূর্তি। বলবাহু যুগল যেন স্তব্ধ নিঃসার। শর সন্ধানে আগ্রহ হীন।

ব্যগ্র আগ্রহে বিভীষণ বলেন,—প্রভু, আপনি একবার হৃদয়হীন হয়ে ক্ষিপ্র হোন। শত্রু সংহারে ক্ষণমাত্র সুযোগও অব্যবহারে নষ্ট করতে নেই।

—কিন্তু, রাক্ষসরাজ বিভীষণ, মহিরুহ যখন নিপতিত হয় তখন বহু লতাগুল্মের নিঃশেষ হয়। তা ছাড়া রাবণের এ মূর্তি রাক্ষসের মায়াজাল কিনা বুঝতে হবে।—সংলাপের মধ্যভঙ্গে হঠাৎ রামের চক্ষু দীপ্ত হয়ে ওঠে। দেখতে পান, হরিদ্বর্ণ অশ্বযোজিত এক দিব্য স্বর্ণরথ এগিয়ে আসছে তারই দিকে। এক মহা আশ্বাসের আনন্দে অন্দোলিত হয় তাঁর আঁখি পত্র।

রাঘবের সম্মুখে এসে রথ থেকে অবতরণ করেন ইন্দ্র সারথি মাতলী। নিবেদন করেন,—কাকুস্থ্য, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র আপনার বিজয় কামনায় এই রথ, ইন্দ্র মহাধনু, শর, কবচ ও শক্তি পাঠিয়েছেন। আপনি এই রথে আরোহণ করে রাবণ বধে অগ্রসর হোন।

ভগবান অগস্ত্য দ্রুত এসে রামচন্দ্রের কর্ণমূলে গোপন সর্বশত্রু বিনাশন সনাতন গুহ্য 'আদিত্য-হৃদয়' স্তোত্র শিক্ষা দিয়ে গেলেন।

দূর থেকে দেখে অট্টহাস্যে রাবণ বললেন,—রামচন্দ্র, ত্রিভুবনের

সর্বশক্তি সংহত করেও তোমার কাপুরুষ-অন্তর রাবণ ভীতি থেকে মুক্ত হতে পারছে না। অগস্ত্যাদি ঋষি-ব্রাহ্মণের মন্ত্রশক্তিও প্রয়োজন হয়েছে। তথাপি জেনে নাও রাম, আমি যদি ইচ্ছা করি তবে তোমার সমস্ত শক্তিই এক লহমায় নিঃশেষ করে দিতে পারি। কিন্তু……… ।—অকস্মাৎ রামের তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে রাবণের কুণ্ডল ভূষিত মুকুট ধূলায় লুণ্ঠিত হল।

কিন্তু দেখে বিস্মিত হন রাম, রথে নিশ্চল-নিস্পন্দে দণ্ডায়মান রাবণ সহাস্যে ব্যঙ্গ করছেন। ক্ষিপ্র থেকে ক্ষিপ্রতর হয় ক্রুদ্ধ রামের অস্ত্র চালনা। কিন্তু বারংবার ব্যর্থ হচ্ছে তাঁর রাবণের শিরচ্ছেদন প্রয়াস।

মাতলি বিস্মিত হয়ে বলেন,—আশ্চর্য এই রাবণ। আশ্চর্য রাবণের মুকুট সন্নিবেশ কৌশল।

নির্বানোন্মুখ প্রদীপের মত সহসা একবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন রাবণ। মুহুর্মুহু অস্ত্র প্রহরণে বারংবার মথিত করেন ইন্দ্রদত্ত রথাশ্ব আর সারথী মাতলিকে। অস্ত্রচালনায় অক্ষম ও মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েন রামচন্দ্র। রামশিবিরে ওঠে হাহাকার। হাহাকার ওঠে দেবতা আর ঋষিদের কণ্ঠে। বিজয়োল্লাসের রব ওঠে রাক্ষস সেনানীর কণ্ঠে। কিন্তু ধীরে ধীরে যেন শিথিল হয়ে যায় রাবণের বাহু যুগল। নিস্তেজ হয়ে পড়েন তিনি। নিশ্চল শিলামূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকেন রথের উপর।

মাতলির ব্যগ্রকণ্ঠ শুনে সচকিত হয়ে ওঠেন রাম,—রাঘব, রাবণ বিনাশের মহেন্দ্রক্ষণ সমুপস্থিত। আপনি ব্রহ্মাদত্ত রাবণ-নিধন ব্রহ্মাস্ত্র মোচন করুন।

চক্ষুর নিমেষে ভীষণ কালাগ্নিসম সেই ব্রহ্মাস্ত্র রাবণের বক্ষ লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেন রামচন্দ্র।

রণে নিশ্চেষ্ট, হীণবল, মোহগ্রস্থ রাবণের বক্ষ ভেদ করে যায় সেই অব্যর্থ অমোঘ অস্ত্র। ছিন্নমূল বিশাল শাল্মলীর মত ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে রাবণের দেহ।

বিজয়োল্লাসে চীৎকার করে ওঠে কপি সেনানী। দেবতাগণ দুন্দুভি নাদে রামচন্দ্রের বিজয় ঘোষণা করেন। স্তব্ধ হয়ে যায় রাক্ষস সেনানীর রণোল্লাস।

বীরের মৃত্যু দেখতে এগিয়ে যান রাম লক্ষ্মণ আর যত কপি বীরগণ। মৃত্যুযন্ত্রণা-কাতর রাবণ রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করে যন্ত্রণা জড়িত কণ্ঠে বলেন,—রাম, এ জয় তোমার জয় নয়। এ জয় ত্রিভুবনের প্রতারণাময় রাজতন্ত্রের জয়। প্রতারণার জয়। মিথ্যার জয়। আমার ভুলই আমার মৃত্যুর ব্রহ্মাস্ত্র। গণশক্তিই ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ শক্তি জেনেও আমি সেই গণচেতনাকে জাগ্রত করতে বিলম্ব করেছিলাম, তাই তোমার ন্যায় পাপিষ্ঠ রাজার পাপ-হস্তে আমাকে মৃত্যু বরণ করতে হল।

—আপনি শত্রু হলেও প্রবল প্রতাপ খ্যাতিমান নীতিজ্ঞ' মহাবীর, নিঃশঙ্ক ও মহোৎসাহী। দুর্লভ রাজনীতি শিক্ষালাভ আপনার কাছ থেকেই সম্ভব।

সকাতর স্মিতহাস্যে রাবণ বলেন,—রাম! এ সময় তোমার কথা বিদ্রূপ ভিন্ন আর কিছু নয়। তুমি আমার সম্পূর্ণ বিপরীত পথের যাত্রী, তথাপি জেনে নাও রাম সকল নীতির সার মানবনীতি। ত্যাগ, নিষ্ঠা, সততা, সহৃদয়তা আর উদারতা সেই নীতির স্বর্ণস্তম্ভ। ত্রিভুবনের নিপীড়িত, নির্যাতীত, বঞ্চিত মানুষগুলোর জন্য স্বর্গের সোপান রচনা করে যেতে পারলাম না, এই দুঃখ নিয়ে অনুতপ্ত অন্তরে মৃত্যুবরণ করছি—বলতে বলতে স্তিমিত হয়ে আসে রাবণের কণ্ঠ। ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যায় তাঁর হৃৎস্পন্দন। রক্ষোপুরীতে ওঠে বিলাপের রোল। ক্রন্দনের রোল ওঠে নিঃস্ব অসহায় প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে।

—০—